নদীয়ার পুতুলনাচ

মোহিত রায়

করুণা প্রকাশনী। কলিকাতা - ৯

প্রথম প্রকাশ ☐
১৯৯৫

প্রকাশক ☐
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ টেমার লেন
কলকাতা - ৯

প্রচ্ছদ ☐
ধীরেন শাসমল

মুদ্রাকর ☐
সেটকন
১০ ওল্ড পোস্ট আফিস স্ট্রিট
১১৪ নং ঘর (চতুর্থ তল)
কলকাতা - ১

ভূমিকা

ব্রিটিশ আমল থেকেই ইংরেজি শিক্ষার ফলে আমাদের শিক্ষিত শ্রেনী লোকসংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করতে থাকেন। অবশ্য তাঁরা ভারতের যাবতীয় প্রাচীন সংস্কৃতিকেও একই মনোভাব নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছেন। কিন্তু যখন দ্বারকানাথ ঠাকুর ও তাঁর ভারতীয় সহযোগীদের ইউরোপীয়দের সাহায্যে এদেশে দ্রুত শিল্পায়ন করে ইউরোপের মতো শিল্পবিপ্লব করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল, তখন থেকেই প্রাচীন ও গ্রামীণ সব সংস্কৃতিরই প্রগতিশীল অংশের অনুসন্ধান ও তার রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা শুরু হয়ে যায়। সংস্কৃতি আন্দোলনের বিচারে রামমোহন রায়ের পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মানুষ। তিনি তাঁর সমাজসংস্কারমূলক কাজগুলির ও সাহিত্যকীর্তির সমর্থন খুঁজতে প্রাচীন শাস্ত্র ও শিল্পসংস্কৃতির উপর নির্ভর করতেন, তেমনি আবার কবিয়াল ভোলা ময়রা-রূপচাঁদ পক্ষীর গান শুনতে তিনি খুবই ভালবাসতেন, সমাজের উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয় মনে করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ হয়ে দীনেশচন্দ্র সেন ও মনসুরউদ্দিন পর্যন্ত পৌঁছিয়ে বুঝতে পারি যে আমাদের ইতিহাসের দিক্‌পালেরা অত্যন্ত সচেতনভাবে ইংরেজসৃষ্ট বিজাতীয় মনোভাবকে দূর করে দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে জাতীয় মনোভাব সৃষ্টি করছেন। তার অর্থ এই নয় যে আন্তর্জাতিক বিকাশ যার সঙ্গে আধুনিক শিল্পায়নও জড়িত তার থেকে তাঁরা সংকীর্ণ জাতীয়বাদী জগতে সংস্কৃতিকে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের থেকে কে বেশি আন্তর্জাতিক সেদিন জন্মেছিলেন? বিশ সালের গান্ধী আন্দোলনের যখন তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন তখন চিত্তরঞ্জন দাস থেকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সকলেই তাঁকে সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাতে বিচলিত না হয়ে শান্তিনিকেতনকে ভিত্তি করে বাঙালী সংস্কৃতির গ্রামীন রূপকে রক্ষা করার চেষ্টা একান্তভাবে চালিয়ে গেছেন।

আমার মতো যারা গণনাট্য সংঘের কর্মী চল্লিশের দশকে প্রকৃতপক্ষে ওঁদেরই ঐতিহ্য অনুসরণ করে কাজ করেছি এবং ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় মহম্মদ আলি পার্কে 'বাবু' সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির একই মঞ্চে যে অনুষ্ঠান করেছি তাকে বলা যায় এযুগে লোকসংস্কৃতিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার শুভ সূচনা (Landmark)।

ইদানীংকালে ইতিহাসবেত্তারা রাজা-মহারাজা নবাব-বাদশা ও রাজধানী-শহরভিত্তিক ইতিহাসচর্চার তুলনায় সমাজের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ইতিহাস অনুসন্ধানকে মূল্য দিচ্ছেন— History from the below. এই চেতনা আপনা থেকে আসেনি। গত ৮০ বছরে বিশ্বজনীন ঘটনা থেকে এই চেতনার উদ্ভব। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তিপ্রচেষ্টার নামে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী তুললেন, তখন থেকেই বিষয়টি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মননের ক্ষেত্রে আলোচিত হতে শুরু করে। অক্টোবর বিপ্লবের পর মহাবিপ্লবী লেনিন প্রকৃতপক্ষে এই নীতিকে কার্যকরী করার জন্য কেবল নিজ দেশে নয়, সারা পৃথিবীতেই সংগঠন গড়ার ব্যবস্থা করেন। লেনিনের উপনিবেশ

সংক্রান্ত নীতি আজও তৃতীয় বিশ্বে প্রগতিশীল আন্দোলনের পরিচালক-নীতি (Directive Principle)। মৃত্যুর আগেই লেনিন আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়ানে সেই নীতি ঠিকমতো পালিত হচ্ছে কি না? বস্তুত সোভিয়েত ইউনিয়ানের পতন সম্পর্কে যদি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে লেনিনের এই নীতি ঠিকমতো পালিত হয়নি বলেই সোভিয়েত ইউনিয়ানের তথাকথিত সাম্যবাদী শাসনের অবসান হয়েছে। এই আলোচনা দীর্ঘ না করে যা বলতে চাই তাহচ্ছে যে ভারতের সাম্প্রতিককালে যে Ethnic ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের দাবী উঠছে তার কারণও অনেকাংশে আত্মবিকাশের সমস্যার সঙ্গে জাড়ত।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর এবং জমিদারী প্রথার অবসান ঘোষিত হলে একই ধরনের ঘটনা শুরু হয়—রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের মধ্যেকার সম্পর্কের যে দ্বন্দ্ব আছে তা ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে। সরকারি, বেসরকারী ও আধা-সরকারী ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত বুদ্ধিজীবীরা এই দ্বন্দ্বের রূপকে বুঝবার জন্য চেষ্টা শুরু করেন।

আমার ত্রিশ দশকের বন্ধু ও সহকর্মী প্রয়াত বিনয় ঘোষ মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রথম এই দ্বন্দ্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছিলেন।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক মোহিত রায় বিনয় ঘোষের সূত্রেই আমার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার লোকসংস্কৃতি পর্ষদ গঠন করলে মোহিত রায়ের সঙ্গে আমাদের কার্যকরী সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অনুসন্ধানের ফলে আমরা অল্পদিনের মধ্যেই বুঝতে পারি যে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিতে লোকনাট্য আজও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে বসে আছে। পুতুলনাচ এই লোকনাট্য গোত্রের এবং কিছু অঞ্চলে প্রভাবশালী। আমাদের শহরের কেবল সাধারণ সংস্কৃতিকর্মী নন, সর্বাপেক্ষা প্রচলিত সংবাদপত্রের লেখকেরও ধারনা পুতুলনাচ অবলুপ্তির পথে, তা যে ঠিক নয়, তা মোহিত রায় অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করেছেন। সিনেমা, টি.ভি.- সহ গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃত ভি.ডি.ও পার্লার প্রভৃতির আক্রমণ থেকেও পুতুলনাচ কি ভাবে আত্মরক্ষা করে এবং কেন করে—তারও সঠিক ব্যাখা মোহিত দিয়েছেন। যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে সারা ভারতের রাজনীতি আজ বিপর্যস্ত, গ্রামের পুতুলনাচের শিল্পীরা কিভাবে তার থেকে দূরে রয়েছে—তারও বিবরণ মোহিতের বইতে আছে।

তাই কেবলমাত্র পুতুলনাচের বিষয় হলেও সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে জনসাধারনের যে নিজস্ব সংগ্রাম, তার ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে এই বই গুরুত্ব পাবে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ মোহিতের পদ্ধতিটাই ইতিহাস আশ্রয়ী। লোকসংস্কৃতির গবেষক ও পাঠকেরা এই বইতে উপকৃত হবেন বলে আমি মনে করি।

সুধী প্রধান

২.১২.১৯৯৪

পুতুলনাচ ঐতিহ্যমন্ডিত। পুতুলনাচ আমাদের চিরায়ত লোকসংস্কৃতির অঙ্গ, উল্লেখ্য উজ্জ্বল গৌরবময় লোকনাট্য। পুতুলনাচ সর্বশ্রেণীর জনগণের বিশেষত সাধারণ মানুষের কাছে আকর্ষণীয় ও সুলভ মনোরঞ্জনের মাধ্যম, পুতুলনাচ লোকশিক্ষার বাহন।

নদীয়ায় সনাতনী পুতুলনাচ সুপ্রচলিত। এই মুহূর্তে নদীয়া ভিন্ন অন্যত্র কোথাও এত অধিক সংখ্যক পুতুলনাচের দল নেই, পুতুলনাচের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত শিল্পীকর্মীর সংখ্যাও নদীয়ায় সর্বাধিক। শুধু দেশভাগের পর বর্তমানকালে নয়, অতীতেও নদীয়ায় পুতুলনাচ ছিল। তাই, নদীয়া ঐতিহ্যবাহী সনাতনী পুতুলনাচের ঐতিহ্যগত স্থায়ী প্রতিষ্ঠাভূমি।

'নদীয়ার পুতুলনাচ' বিষয়ে আমার লিখিত একটি রচনা পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখকশিল্পী সংঘের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক তথা কার্যদক্ষ কৃতী সংগঠক চিত্রশিল্পী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে 'নন্দন' পত্রিকায় ডিসেম্বর ১৯৯৩ সংখ্যায় প্রকাশিত ও সমাদৃত হয়। আমার উল্লিখিত রচনার পরিকাঠামোতে নদীয়ার পুতুলনাচ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যপূর্ণ সচিত্র গ্রন্থ : 'নদীয়ার পুতুলনাচ।' এই গ্রন্থ নদীয়ার ঐতিহ্যবাহী সনাতনী পুতুলনাচ বিষয়ে প্রথম প্রয়াস। প্রত্যেকেরই সীমাবদ্ধতা থাকে। আমার সীমাবদ্ধতায় অপূর্ণতা থেকে গেল, ভবিষ্যতে কেউ পূর্ণ করবেন বলে আশা রাখি।

নদীয়ার পুতুলনাচ বিশেষত তারের পুতুলনাচ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে দীর্ঘদিন ধরে অকৃপণ সহযোগিতা করেছেন পশ্চিমবঙ্গ পুতুলনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও পুতুলনাচের লোকশিল্পীদরদীপ্রাণ বন্ধুবর সুশান্ত হালদার এবং তাঁর আহ্বানে আমন্ত্রণে পশ্চিমবঙ্গ পুতুলনাট্য সংঘের বার্ষিক সম্মেলনে কয়েকবার যোগদান করার সুযোগ পেয়েছি।

স্বর্গত নীলকান্ত চক্রবর্তী, জীতেন হালদার, সতীশ সমাদ্দার, দুলাল বৈষ্ণব, অমরকৃষ্ণ দাস, গোপাল অধিকারী, সুমিত্রা মিস্ত্রী, রাসকান্ত ঠাকুর, বদন বিশ্বাস, ধীরেন্দ্রনাথ মিস্ত্রী, পঙ্কজকুমার মল্লিক, মনীন্দ্রকুমার বিশ্বাস, সুনীলকুমার বিশ্বাস, মনোরঞ্জন রায়, মনোরঞ্জন পন্ডিত, যতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, সমরেশ গায়েন, বিমলকৃষ্ণ বিশ্বাস, সুধীর সর্দার, কপিলদেব হালদার ও নিরঞ্জন মন্ডল প্রমুখ নদীয়ার তারের পুতুলনাচের শিল্পকর্মীদের কাছ থেকেও পেয়েছি অকুণ্ঠ সহযোগিতা আর নানা তথ্য। তাঁরা এই গ্রন্থরচনায় আমাকে উৎসাহিত করেছেন, প্রাণিত করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে নদীয়ার রাণাঘাটে ২২ জুলাই-৫ আগস্ট ১৯৯০ পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠিত পুতুলনাচের লোকশিল্পীদের প্রথম প্রশিক্ষণ শিবিরে অন্যতম সংযোজক-সমন্বয়ীরূপে সংযুক্ত থেকে সমসাময়িক পুতুলনাচের খ্যাতনামা শিল্পী রূপকার সুরেশ দত্ত ও হীরেন ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসবার সুযোগে পুতুলনাচ বিষয়ে নানা তথ্যে সমৃদ্ধ হয়েছি। এই প্রশিক্ষণ শিবির সহ নদীয়ার বগুলায় ৩০-৩১ অকটোবর ১৯৮৭ অনুষ্ঠিত কর্মশালায় এবং নদীয়ায় ১৭-২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ স্বরূপগঞ্জে ও ২০-২৭ জানুয়ারি ১৯৯১ চাকদহ সহ নানাস্থানে অনুষ্ঠিত পূর্বাঞ্চলীয় পুতুলনাচের দুটি উৎসবে যোগদান করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ও বহির্বঙ্গের নানা অঙ্গের পুতুলনাচের লোকশিল্পীদের

সান্নিধ্যেও সনাতনী পুতুলনাচ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন করেছি।

এছাড়া, তথ্যসংগ্রহে - গ্রন্থরচনায় নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন হীরেন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক আবুল আহ্‌সান চৌধুরী (বাংলাদেশ), অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী, অজিত দাস, বিশ্বনাথ সাহা, স্বপনকুমার ভৌমিক, সুবলচন্দ্র মৈত্র, রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদের সদস্যসচিবদ্বয় মানিক সরকার (প্রাক্তন) ও চন্দন চক্রবর্তী (বর্তমান) প্রমুখ।

এই গ্রন্থে সংকলিত নদীয়ার তারের পুতুলনাচের কয়েকটি পালার অংশবিশেষ তারের পুতুলনাচের খ্যাতনামা মাস্টার সতীশ সমাদ্দারের সৌজন্যে সংগ্রহ করেছি।

পুতুলনাচের ফটোগুলি পেয়েছি সুশান্ত হালদার, কাজল বিশ্বাস, সুব্রত ভট্টাচার্য, পীতম ভট্টাচার্য, গৌতম ধনী ও মনামি রায় প্রমুখের কাছ থেকে। পুতুলনাচ বিষয়ে ছবি অঙ্কন করেছেন চিত্রশিল্পী বিধান বিশ্বাস। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদের সভাপতি তথা প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পথিকৃৎ শ্রদ্ধেয় সুধী প্রধান এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখায় আমার গ্রন্থেরই গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। পুতুলনাচ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সাক্ষাৎ আলোচনাদি করার সৌভাগ্যও লাভ করেছি। তাঁকে শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

'খেয়া'
গেট রোড
কৃষ্ণনগর - ৭৪১১০১
নদীয়া

মোহিত রায়

আকুলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

মোহিত রায়

লিখিত - সম্পাদিত

নদীয়া বিষয়ক গ্রন্থমালা

- ☐ নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি (পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশন)
- ☐ নদীয়া স্থাননাম
- ☐ নদীয়ার সমাজচিত্র
- ☐ নদীয়ার সেকালের বিদ্যাসমাজের কথা ও কাহিনী
- ☐ নদীয়া উনিশ শতক
- ☐ নদীয়া কাহিনী
- ☐ ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত
- ☐ রূপে রূপে দুর্গা
- ☐ সতীদাহ
- ☐ দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনচরিত
- ☐ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে নদীয়ার লোকসংস্কৃতি
- ☐ শিবনিবাস
- ☐ বারোদোলের মেলা
- ☐ এক ভাঁড় গোপাল
- ☐ নদীয়ার পুতুলনাচ

নদীয়ার পুতুলনাচ

পুতুল মানুষের আদিমতম সৃষ্টি। নদীয়া জেলায় নানা স্থানের মৃত্তিকাগর্ভ থেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক স্তরবিন্যাসে পাওয়া গেছে মাটির, পাথরের ও ধাতুর পুতুল। সামাজিক-সাংস্কৃতিক জনইতিহাসের বিবর্তনের সঙ্গে নদীয়া জেলায় মানুষের তৈরি পুতুলের ব্যবহার, ক্ষেত্র, উপকরণ, গঠনশৈলী, নির্মাণকৌশল, আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন হয়েছে। নদীয়ার লোকায়ত জনজীবনে ব্রত ও পূজায় ননীর, পিটুলীর, মাটির, কাপড়ের, ঘাসের, শোলার, সরের ও সন্দেশের পুতুল আজও প্রচলিত।

বাংলার অন্যান্য স্থানের মতো নদীয়ায় মাটির, কাঠের, গালার ও অধুনা অন্যান্য নানা উপাদানের পুতুল শিশুদের ক্রীড়ার ও গৃহসজ্জার উপকরণ। কিন্তু, শিশুদের খেলার পুতুল নিয়ে খেলা হল পুতুল খেলা, পুতুলনাচ নয়। পুতুলনাচের পুতুল (Puppet) শিশুদের খেলার পুতুল (Doll) বা বড়দের পূজিত পুতুল-প্রতিমা নয়। মানুষের পুতুল নিয়ে নাচিয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে জনসমক্ষে উপস্থিত করা হল পুতুলনাচ। পুতুলনাচ হল মানুষের পুতুল নাচানোর লোকরঞ্জন প্রমোদ অনুষ্ঠান, লোকশিক্ষার অনুষ্ঠান। পুতুলনাচ চিরায়ত লোকসংস্কৃতির অঙ্গ লোকনাট্য।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৭-১৯৫৯) লিখিত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' অনুযায়ী পুতুলনাচ হল: 'উৎসবাদিতে পুতুলের নৃত্যরূপ তামাশা। ইহাতে মানুষ পুতুল নাচাইয়া পৌরাণিক বা সাংসারিক বিষয়ে অভিনয় করে।' পুতুলনাচকে পুতুলবাজিও বলা হয়।

সুপ্রাজ্ঞ সুকুমার সেন (১৯০০-১৯৯২) তাঁর 'নট নাট্য নাটক' গ্রন্থে লিখেছেন যে গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন আসলে ছিল পুতুলনাচ পালা বা পুতুলবাজি সহযোগে কৃষ্ণকাহিনী পদগীতি।

পুতুলনাচ সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত বলে উল্লেখ করেছেন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (১৮৬৯-১৯৪০) তাঁর 'ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা' গ্রন্থে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে 'সোনার পুতুলি', কাশীদাসী মহাভারতে 'চিত্রের পুতলী', 'পটের পুতুলী', 'পদকল্পতরু' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ)-তে 'চীত (চিত্র) পুতুলী'-র উল্লেখ আছে। কৃষ্ণনগরে নদীয়ারাজসভার সভাসদ্ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (১৭১২-৬০) লিখেছেন: 'পুতুলের বিয়া' ও 'সোনার পুতুল'। শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬ - ১৫৩৩)-এর কালে নদীয়ায় পুতুলনাচ প্রচলিত ছিল—তার প্রমাণ পাই শ্রীচৈতন্যজীবনীমূলক কাব্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ (আনু. ১৫৩০-১৬১৫) রচিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-তে: 'কাষ্ঠের পুত্তলি যেন কুহকে নাচায়।' আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী জানা যায় যে কুহক সম্প্রদায়ের জীবিকা ছিল পুতুল নাচিয়ে দর্শকদের দেখানো।

একদা নদীয়ায় নানা শৈলীর সনাতনী ঐতিহ্যমণ্ডিত পুতুলনাচ প্রচলিত ছিল : ছায়া পুতুলনাচ, লাঠি বা ডাণ্ডের পুতুলনাচ, বেণীপুতুলনাচ বা দস্তানাপুতুলনাচ ও তারে বা সুতোয় টানা পুতুলনাচ।

দীনেন্দ্রকুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩) তাঁর 'পল্লীবৈচিত্র্য' (প্রথম সংস্করণ ১৩১২ সন) গ্রন্থে সেকালের নদীয়ার জনসাংস্কৃতিক প্রামাণ্য চিত্র তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থের 'কার্তিকের লড়াই' রচনায় তিনি লিখেছেন : '.....পূজার দালানের সম্মুখে একটা জায়গা চাটাই দিয়া ঘিরিয়া সেখানে পুতুলনাচ আরম্ভ হইয়াছে। অনেক লোক চারিদিকে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হালদার-বাড়িতে তখন পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে। আহারাদির বিশেষ কোন আয়োজন নাই। ঠাকুরঘরে আলোকের কোনও আড়ম্বর নাই, একটা উচ্চ দীপগাছার উপর একটা মাটির ডেল্‌কো মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে; কয়েকখানি নৈবেদ্য রেকাব দিয়া ঢাকা রহিয়াছে; ঘরের মধ্যে একটিও লোক নাই, শুধু একটা ক্ষুধার্ত কালো বিড়াল সেখানে আহারান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সকল লোক ছায়াবাজীর পুতুল-নাচ দেখিতেই ব্যস্ত! বাজনা বাজিতেছে, ছায়াবাজীর পুতুলেরা অদৃশ্য-হস্তচালিত হইয়া, নাচিতেছে, ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ছায়াবাজীর দলের লোক তালে তালে পা ফেলিয়া নূপুর বাজাইতেছে; দর্শকগণ ভাবিতেছে, বুঝি পুতুলের পায়েই নূপুর বাজিতেছে! কিন্তু পটান্তরালবর্তী লোকগুলি চাপা গলায় অনুনাসিক স্বরে পুতুলের বক্তৃতাস্বরূপ যে কথাগুলি বলিয়া যাইতেছে, সেগুলি কিছুমাত্র সুশ্রাব্য নহে। ছায়াবাজীতে নানাপ্রকার দৃশ্য প্রদর্শিত হইতেছিল। একটা জেলে নদীর ধারে বসিয়া ছিপে মাছ ধরিতেছে, দৈবক্রমে একটা কুমীর আসিয়া সেই বঁড়শী গিলিল, প্রকাণ্ড মাছ পড়িয়াছে ভাবিয়া জেলে ছিপ ধরিয়া টানাটানি করিতে করিতে জলে নামিয়া পড়িল, জলে পদস্পর্শ হইবামাত্র কুমীর জেলের পা চাপিয়া ধরিল; জেলে তখন ছিপখানি ফেলিয়া দিয়া হতভম্ব ভাবে দুই হাতে মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া তীরে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কৃতকার্য হইল না। কুমীর তাহাকে গভীর জলে টানিয়া লইয়া গেল। নদীটি দেখিতে দেখিতে হঠাৎ সাগরে পরিণত হইল; সমুদ্রবক্ষে শ্রীমন্ত সদাগরের নৌকা আসিয়া উপস্থিত!—গণেশকে কোলে লইয়া কমলে-কামিনী দূরে কমলবনে বসিয়া গণেশের মুখচুম্বন করিতেছেন,—রমণী পদ্মবনে বসিয়া হস্তী গিলিতেছেন ভাবিয়া শ্রীমন্তের বিস্ময়ের সীমা নাই! বায়স্কোপের ছবির মত মুহূর্তমধ্যে সমুদ্র ও কমলবন অন্তর্হিত হইল। তখন দেখা গেল, পঞ্চবটীবনে জটাবল্কলধারী রামলক্ষ্মণের আবির্ভাব হইয়াছে! সূর্পনখা নাচিতে নাচিতে আসিয়া লক্ষ্মণের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিল। লক্ষ্মণ কোনও উত্তর না করিয়া অবলীলাক্রমে তাহার নাসাকর্ণ কাটিয়া দিলেন। সূর্পনখা কাঁদিতে কাঁদিতে দশমুণ্ড রাবণের কাছে গিয়া নাকি সুরে বলিল, দাঁদাঁ গোঁ, নখাঁ বেঁটা আমাঁর নাঁক কাঁন কেঁটে নিয়েছেঁ; দশানন এ কথা শুনিয়া দশটা মাথা নাড়িয়া রাগ প্রকাশ করিতে লাগিল। রাম-রাবণের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ঘোরতর যুদ্ধ! হনুমান দীর্ঘলেজ লইয়া লাফাইয়া রাবণের মাথায় উঠিয়া তাহার দাড়ি-গোঁফ ছিঁড়িয়া পলাইতে না পলাইতে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইল, এবং দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-উপলক্ষে ভীমের সঙ্গে রাজগণের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ভীম একজন রাজাকে জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া অন্য একজন রাজার গায়ে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছেন, এবং দুই রাজাই মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছেন। অর্জুন বাণবৃষ্টি করিয়া জন কত রাজাকে অস্থির করিয়া

দিতেছেন ; দূরবর্তী ব্রাহ্মণেরা ভীমার্জুনের বিক্রম দেখিয়া হাত মুখ নাড়িয়া ও বিষম অঙ্গভঙ্গি করিয়া নানা প্রকার ইঙ্গিত করিতেছেন,—দেখিয়া দর্শকগণ পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল! এই প্রকার বিবিধ দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। রাত্রি প্রায় তিনটার সময় পুতুল-নাচ বন্ধ হইয়া গেল। সকলে কলরব করিতে করিতে বাড়ি ফিরিতে লাগিল।' দীনেন্দ্রকুমার রায়ের পুতুলনাচের এই বিবরণ থেকে প্রায় একশো বছর আগেকার অবিভক্ত নদীয়ায় সুপ্রচলিত পুতুলনাচ সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া যায়। 'ছায়াবাজীর পুতুলনাচ' শব্দে অনুমিত হয়—এই পুতুলনাচ ছিল ছায়া পুতুলনাচ। আবার, 'পুতুলেরা অদৃশ্য হস্তচালিত' শব্দে মনে হয় বেণী পুতুলনাচ। যেহেতু দীনেন্দ্র কুমার রায় ছায়া বাজীর কথা বারবার উল্লেখ করেছেন, সে কারণে আমরা মনে করি এই পুতুলনাচ ছায়াপুতুলনাচই ছিল। সেকালে রামায়ণ মহাভারত মঙ্গলকাব্যের নির্বাচিত খণ্ড খণ্ড দৃশ্য পরপর দেখানো হত, পুরো পালা হত না। সেকালে পুতুলনাচ অত্যন্ত আকর্ষণীয় লোকরঞ্জন অনুষ্ঠান ছিল। এই রচনাতেই দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন : 'ঢপ চলিতেছে, এমন সময় সংবাদ আসিল, হালদার বাড়ি ছায়াবাজীর পুতুলনাচ হইতেছে। শুনিয়া ছেলেরা আর মুহূর্তকালও সেখানে বসিল না, পাঠশালার ছুটি হইলে ছাত্রেরা যেমন এক সঙ্গে গোল করিতে করিতে ছুটিয়া বাহির হয়, ঢপের আসর হইতেও তাহারা সেই ভাবে বাহির হইয়া হালদার বাড়ির দিকে ছুটিল।'

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৮৫) তাঁর 'ফিরে ফিরে চাই' গ্রন্থে শৈশবের স্মৃতিচারণে নদীয়ার রাণাঘাটের ছোটবাজারে রাধাবল্লভ ঠাকুরের মন্দিরের রাধাবল্লভতলায় বারোয়ারি মেলায় পুতুলনাচের কথা উল্লেখ করেছেন: 'মেলার মধ্যে পুতুলনাচ দেখতে খুব ভাল লাগতো। বাঁশের চাঁচ বা দরমা-আঁটা অন্তরালের পেছনে দাঁড়িয়ে লোকে পুতুল নাচাচ্ছে—রাজা রাণী এলেন, হাত নাড়তে নাড়তে—নারদ আসছেন ঢেঁকিতে। ঘাড় নড়ছে দাড়ি নড়ছে—মনে হয় যেন কথা বলছে। মন্থরা কৈকেয়ীকে পরামর্শ দিচ্ছে—রত্নহার দিচ্ছেন রাণী — ভরত কুঁজিকে নিগ্রহ করছেন —এই ধরণের সব। তখন তো সিনেমা ছিল না, তাই লোকে এই পুতুলনাচ দেখেই খুশী হতো। বৃদ্ধ বয়সে বিদেশে উচ্চাঙ্গের পুতুলনাচ (Puppet Show) দেখেছি। কিন্তু বাল্যকালের দেখা ছবিগুলি আজও মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারে। আজকাল এদেশেও পুতুলনাচের অনেক উন্নতি হয়েছে। তাতে গ্রামের সুরটি পাই। বড়ই Sophisticated,' —প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের এই বিবরণ অনুযায়ী বলা যায় যে এই পুতুলনাচ ছায়াপুতুলনাচ ছিল না। আমরা মনে করি, এই পুতুলনাচ ছিল বেণীপুতলনাচ।

কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৮৮৭-১৯৬৪) লিখিত 'শান্তিপুর পরিচয়' দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থে (১৩৪৯ সনে প্রকাশিত) নদীয়ার পুতুলনাচ সম্পর্কে অসামান্য তথ্য আছে। তিনি লিখেছেন যে শান্তিপুর বড়বাজারে ব্রহ্মাপূজা প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে প্রবর্তিত হয় এবং বৈশাখী পূর্ণিমা থেকে ৫ দিন ব্যাপী পূজা ও নানা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সেকালে পুতুলনাচ এই

অনুষ্ঠানে দেখানো হত। এই গ্রন্থেই অন্যত্র তিনি লিখেছেন : 'গোপাল পেয়াদার (মুসলমান) পুতুলনাচের (পৌরাণিক বিষয়মূলক) দল ছিল।' কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রদত্ত তথ্যে আমরা জানতে পারছি যে সেকালে নদীয়ায় পুতুলনাচের দলে মুসলমান লোকশিল্পীরাও যুক্ত ছিলেন এবং ধর্মীয় ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে অসাম্প্রদায়িক মুসলমান লোকশিল্পীরা পৌরাণিক পুতুলনাচের পালা পরিবেশন করতেন—সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল নজির। পুতুলনাচের লোকশিল্পী শান্তিপুরের গোপাল পেয়াদার বংশধরদের আমরা খুঁজে পাইনি, সম্ভবত ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা শান্তিপুর ত্যাগ করেন। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের বিবরণ থেকে কী ধরণের পুতুলনাচ গোপাল পেয়াদা দেখাতেন—জানা যায় না।

কবি নবীন চন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) গত শতকের শেষে (১৮৯৩-৯৫) নদীয়ার রাণাঘাটের মহাকুমা শাসক ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবন' ৪র্থ ভাগে (১৯১২ সালে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত) তাঁর রাণাঘাট বসবাসকালীন স্মৃতিচারণে শৈশবের কথায় তিনটি কদাকার পুতুলের পুতুলনাচের বাজিকরদের নাচগানের কথা লিখেছেন, অবশ্য তিনি রাণাঘাট, শান্তিপুর বা নদীয়ার কোন স্থানে পুতুলনাচ দেখেছেন বলে উল্লেখ করেন নি। নবীনচন্দ্রের সুবিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রকাশিত হয় ১ বৈশাখ ১২৮২ সনে (১৫ এপ্রিল ১৮৭৫ সাল), এই কাব্যে পুতুলনাচের উল্লেখ আছে: 'নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে......' (দ্বিতীয় সর্গ/১২) এবং 'কাষ্ঠপুতুলের মত....' (চতুর্থ সর্গ/৫)। পুতুলনাচিয়ে শিল্পীদের কবি দক্ষ বাজিকর বলেছেন।

সুধাংশুবালা সরকার (১৮৯৫ - ১৯৮৭) তাঁর 'স্মৃতির মালিকা' স্মৃতিকথায় (এক্ষণ শারদীয় ১৩৯৭) ১৩১৩ সনের তাঁর বিবাহের বিবরণে লিখেছেন: 'তখন বর আসত কতরকম জাঁক জমক করে ল্যাণ্ডো গাড়ি বা তাঞ্জাম চড়ে। সঙ্গে চলত কাগজের মস্ত মস্ত পুতুল, পুতুলনাচ আর গড়ের বাদ্যি, অ্যাসিটিলিন বাতির শোভাযাত্রা।' সেকালে নদীয়া জেলাতেও বিত্তবৈভবশালী পরিবারে কন্যার বিবাহে বরযাত্রী আসতেন সমারোহ পূর্ণ শোভাযাত্রা সহকারে এবং এই শোভাযাত্রায় পুতুলনাচ থাকত, গরুর গাড়ির উপর পুতুলনাচ দেখানো হত বলে প্রবীণদের কাছ থেকে জেনেছি।

কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-৭০) রচিত 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' প্রথম ভাগ গ্রন্থে (১৮৬২ সালে প্রকাশিত) আছে, '.....হঠাৎ দেখলে বোধ হয় যেন পুতুল নাচের নকীব।' নকীব বা নকিব আরবী শব্দ। 'চলন্তিকা' অনুযায়ী অর্থ: 'যে যশ ঘোষণা করে বা পরিচয় দেয় (রাজা ইত্যাদির অথবা রাজদরবারে আগন্তুকের), Herald.' রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আমলে (১৭২৮-৮২ সাল) নদীয়ারাজসভার কবিদ্বয় ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (১৭১২-৬০) ও রামপ্রসাদ সেন (আ. ১৭২০-৮১) তাঁদের কাব্যে নকীব শব্দের উল্লেখ করেছেন। সেকালে পুতুলনাচ পালা শুরু হওয়ার আগে মঞ্চে অবতীর্ণ হত বিচিত্রপোশাকধারী পুতুল, তার নাম নকীব। নকীব-পুতুল নাচগান করে অঙ্গভঙ্গি দেখিয়ে পুতুলনাচের পালার বিবরণ তুলে ধরত। কোনও কারণে মূল পুতুলনাচের পালা শুরু হতে দেরি হলে, নকীব-পুতুলকে

বেশি সময় ধরে নাচ-গান করতে হত। সেজন্য নকীব-পুতুলকে হাসির কথাও বলতে হত। এছাড়া, পালা শুরু হবার আগে দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে হট্টগোল চললে নকীব পুতুলকেই গোলমাল থামিয়ে শান্ত করতে হত। পুতুলনাচে নকীব-পুতুলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সার্কাসদলের জোকারের মতো, তবে জোকারকে সার্কাস চলাকালীন অনুষ্ঠান করতে হয়। নকীব পুতুলকে শুধুমাত্র পালা-শুরুর আগে অনুষ্ঠান করতে হয়। নদীয়া জেলার নাকাশিপাড়া থানার গঙ্গাতীরবর্তী গোটপাড়া গ্রামের অধিবাসী ও নদীয়ারাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের পুত্র গোবিন্দের বংশধর প্রবীণ উমাদাস রায় সূত্রে জেনেছি যে দেশভাগের আগে সেখানে নকীব উপাধিধারী এক মুসলমান পরিবার ছিলেন, এই পরিবারের পূর্বপুরুষ নাকি পুতুলনাচের দলে নকীব-পুতুল নাচাতেন, কথা বলতেন, গান করতেন। পরবর্তী কালে তিনি নাকি নকীব নামে পরিচিত হন, পরে তাঁর বংশধরদের উপাধিই হয়ে যায় নকীব।

নদীয়ায় ছায়া পুতুলনাচ (Shadow Puppet) ছিল মূলত পৌরাণিক বা রামায়ণীয় কাহিনী নির্ভর, এখন আর সনাতনী ছায়াপুতুলনাচ নদীয়ায় নেই। লাঠি বা ডাঙের পুতুলনাচ(Rod Puppet) নদীয়ায় একসময় ছিল বলে শোনা যায়। কৃষ্ণনগরে গোলাপটি বারোয়ারিতে মহিষমর্দিনী পূজায় ডাঙের পুতুলনাচ দেখেছেন বলে বৃদ্ধেরা স্মৃতিচারণ করে থাকেন। এখন নদীয়ায় ডাঙের পুতুলনাচ আর নেই। এই পুতুলনাচের পালা শুধু পৌরাণিক ছিল না, সামাজিক ঘটনানির্ভরও ছিল বলে জেনেছি। বেণীপুতুলনাচ বা দস্তানা পুতুলনাচ (Glove Puppet) নদীয়ায় প্রচলিত ছিল। এখন একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। তারে বা সুতোয় টানা পুতুলনাচ (String Puppet বা Marionette) নদীয়ায় বর্তমানে সুপ্রচলিত।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯০৯-৮৪) তাঁর 'বাংলার লোকসহিত্য' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে কৃষ্ণনগরের পুতুলনাচের প্রচলনের কথা উল্লেখ করেছেন: 'নদীয়া জেলার প্রধানতঃ কৃষ্ণনগর অঞ্চলে যে পুতুলনাচ প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যেও পুতুলের অভিনয়ই মুখ্য স্থান করিলেও ইহাতে যে পুতুলগুলি নির্মিত হয় তাহা .....বৃহদাকৃতি নহে ......কাষ্ঠখণ্ড দিয়াও তৈরী হয় না। .....পুতুলগুলি......ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং নেকড়া দিয়া তৈরী। তবে ইহাদের মধ্যেও পুতুলের নাচ অপেক্ষা অভিনয় অংশই প্রাধান্য লাভ করে।' ঐ গ্রন্থেই তিনি আরও লিখেছেন: 'উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতা এবং তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পুতুলনাচ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল।......ইহার পূর্বে তাহা নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর অঞ্চলেও প্রচলিত ছিল।'

আমি অনেক অনুসন্ধানেও ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বর্ণিত কৃষ্ণনগরের পুতুলনাচের দলের কোন সন্ধান পাই নি। দেশভাগের আগে কৃষ্ণনগরের কোনও পুতুলনাচের দল আমি দেখিনি বা কৃষ্ণনাগরিকেরা কেউ দেখেছেন বলে জানান নি। বাইরে থেকে পুতুলনাচের দল এসে কৃষ্ণনগরে পুতুলনাচ দেখিয়ে গেছেন। কৃষ্ণনগর শহরে কোনও পুতুলনাচের

দল দেশভাগের আগে ছিল বলে প্রমাণ পাইনি। আমি এই বিষয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যকে তাঁর বাড়ির ঠিকানায় বিনীতভাবে একাধিক চিঠি লিখি কিন্তু কোনও উত্তর পাই নি। অনুমিত হয়, নদীয়ার অন্যান্য স্থান থেকে পুতুলনাচের দল কৃষ্ণনগরে এসে পূজাপার্বণ উপলক্ষে ও মেলায় পুতুলনাচ পরিবেশন করত, এইসব পুতুলনাচের দলকেই কৃষ্ণনগরের পুতুলনাচ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য যে কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের সঙ্গে পুতুলনাচের পুতুলের কোনও সম্পর্ক নেই এবং কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা পুতুলনাচের পুতুল তৈরি করেন না।

দেশভাগের আগে নদীয়া জেলায় কালীগঞ্জ-নাকাশিপাড়া থানার গঙ্গাতীরবর্তী গ্রামসমূহে বেণীপুতুলনাচ অর্থাৎ হাতে ঘোরানো-নাচানো দস্তানা পুতুলনাচ প্রচলিত ছিল। এ ব্যাপারে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোকনৃত্য' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ভাগীরথীর তীরের জনপদের পুতুলনাচের উল্লেখ করেছেন, আমরা তাঁর সঙ্গে একমত। নদীয়া জেলায় কালীগঞ্জ থানার গঙ্গাতীরবর্তী এলাকার ঘোড়ুই (ঘোড়ই বা ঘড়াই) উপাধিধারী তফসিল সম্প্রদায়ভুক্তেরা ছিলেন বেণীপুতুলনাচের লোকশিল্পী। অধুনা বেণীপুতুলনাচে খ্যাতনামা হয়েছেন লোকশিল্পী রামপদ ঘোড়ুই (৩৫ বৎসর বয়স্ক, পিতা আশুতোষ ঘোড়ুই), তিনি কিন্তু মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানার মুগবেড়িয়া অঞ্চলের পদ্মতামলী গ্রামের (ডাকঘর: দুমুরদাঁড়ি) মানুষ। পদ্মাতামলী গ্রামে প্রায় চল্লিশটি পরিবার বেণীপুতুলনাচের সঙ্গে যুক্ত এবং তাঁদের অনেকেই ঘোড়ুই উপাধিধারী।

অনুসন্ধানে জেনেছি যে নদীয়ায় সনাতনী বেণীপুতুলনাচের পুতুল তৈরি করা হত বিচিত্র পদ্ধতিতে। একটি পাত্রে জলে মেথি সহ খবরের কাগজের টুকরো ও শোলা (জলজ উদ্ভিদ)-র গুঁড়ো ভেজানোর পর কাগজের মণ্ড তৈরি করা হত। বাম হাতের তর্জনীতে (forefinger) বা একটি ছোট বর্গাকার কাঠের পাটাতনের উপর কাঠের দণ্ডের মাথায় কাগজ জড়িয়ে সুতো দিয়ে বেঁধে তারপর ঐ কাগজের মণ্ড লেপে দেওয়া হত। পিছনে ফাঁকা রাখা হত। মণ্ড শুকিয়ে গেলে তাতে মানুষের মূর্তির চোখ-কান-মুখের অবয়বের আকার দেওয়া হত। রোদে শুকিয়ে কাঠের দণ্ড থেকে আলগোছে কাগজের মণ্ডের মূর্তি বের করা হত। ভিতরের কাগজ বের করে ফেলার পর সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘসে ঘসে মসৃণ করে রঙ দেওয়া হত। মাথায় পাটের কালো চুল আঠায় লাগিয়ে কাপড়ের পোশাকাদি মূর্তিমুখের গলায় লাগানো হত। দুই হাতের প্রথমাংশ কাগজের মণ্ডেই তৈরি করা হত, তার সঙ্গে কাপড় থাকত। পুতুলনাচিয়েরা হাতের প্রথম তিন আঙুলের মাঝের আঙুল পুতুলের মাথায় ফাঁকা জায়গায় ঢুকিয়ে ও অপর দুই আঙুল পুতুলের দুই হাতের মধ্যে ঢুকিয়ে নাচাতেন। নদীয়ার এই সনাতনী বেণীপুতুলনাচের ধারা এখন প্রায় অবলুপ্ত, আজ শুধু স্মৃতি। একসময় তালআটিকেও বেণীপুতুলনাচের পুতুলের রূপ দেওয়া হত বলে জানা যায়। প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য যে নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ থানার অজস্র বিল-বাওরে ও গঙ্গার প্রাচীন খাদে প্রচুর পরিমাণে ফুলশোলা (spongewood) আজও উৎপন্ন হয় এবং

কালীগঞ্জের অন্যতম লোকশিল্প শোলাশিল্প। কালীগঞ্জ থানার হরিনাথপুর গ্রামের শোলার টুপি বিখ্যাত। এই গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ 'বুড়ি মা' কালীপূজার প্রবর্তক নৃসিংহ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্যের বংশধরেরা আজও শোলাশিল্প উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত।

সেকালে নদীয়ায় এই বেণীপুতুলনাচ কিন্তু মঞ্চেই দেখানো হত। লোকশিল্পীরা দাঁড়িয়ে হাতের পুতুল উঁচু করে মঞ্চে নাচাতেন। সামনের দিক মঞ্চাংশ ছাড়া বাকি অংশ পর্দায় ঢাকা থাকত। যাঁরা নাচাতেন, তাঁদের দর্শকেরা দেখতে পেতেন না। বৃদ্ধদের মুখে শুনেছি যে এই পুতুলনাচের পুতুলের নানা বৈশিষ্ট্য ছিল। অনেক পুতুলের চোখ দুটি এমনভাবে সুতোয় লাগানো থাকত যে একটু নাচালেই বা সুতো ধরে টানলেই চোখদুটি ওঠানামা করত। অনেক পুতুলের মুখে থাকত জ্বলন্ত বিড়ি। ঐ পুতুলের মুখের ভিতর থেকে নল বের করা থাকত পিছনে, পুতুল-নাচিয়ে নিজে বিড়ি খেয়ে ধোঁয়া ছাড়তেন ঐ নল দিয়ে, যেন মনে হত—পুতুলই ধূমপান করছে ও ধোঁয়া ছাড়ছে। আবার, ঐ পুতুলেরই মুখের নলের মাধ্যমে পুতুলেরা জল ফেলত অর্থাৎ পুতুলনাচিয়েরা নলে পাম্প করে জল ফেলতেন, যেন মনে হত —পুতুলেরা থুতু ফেলছে। এই পুতুলনাচে কথা ছিল কম, Action -ই বেশি ছিল। কথাও গানের মাধ্যমেই বলা হত। পালাগানের সুরে এই সব পুতুলনাচের পালার গান পরিবেশিত হত। নদীয়ার বেণীপুতুলনাচের পুতুলের মুখ তৈরি ক্রম : প্রথমে ছিল তাল আঁটির খোল (আঁটির আঁশেই চুল দাড়ি হত), পরে মাটির তৈরি পুতুল (না পুড়িয়ে রোদে শুকিয়ে তৈরি করা হত, পরে রঙ করা হত, পাটের চুলদাড়ি আঠায় লাগানো হত), একসময় কাঠেও পুতুলের মুখ তৈরি করা হত, কাগজ আবিষ্কারের পর কাগজের মণ্ডে পুতুলের মুখ তৈরি হত, একসময় রবারে তৈরি পুতুলের মুখও পুতুলনাচে দেখানো হত।

নদীয়ায় বেণীপুতুলনাচে একদা শুধুমাত্র মানুষরূপী পুতুলকেই নাচানো হত না,নানা পশুপাখিরূপী পুতুলকেও নাচানো হত বলে জানা যায়। অনেকক্ষেত্রে নাকি পশুপাখির পুতুলনাচে কোনও সংলাপও থাকত না, শুধুমাত্র নাচানো হত। নদীয়া জেলার নাকাশিপাড়া থানার ব্রহ্মাণীতলায় ব্রহ্মাণী (মনসা) পূজায় পুতুলনাচে সাপের খেলা দেখেছেন বলে স্থানীয় বৃদ্ধেরা জানিয়েছেন। পশুপাখির বেণীপুতুলনাচে কি ঈশপের (Aesop) নীতিগল্প (Fables) অনুযায়ী পশুপাখির পুতুলনাচ দেখানো হত? আমরা অনেক অনুসন্ধানেও এ সম্পর্কে কোন তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারি নি। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে ঈশপ পশুপাখিকে গল্পের পাত্রপাত্রী করে তাদের মুখ দিয়ে ঘটনার মধ্যে দিয়ে নীতিকথা শুনিয়েছেন, যে ধারা পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই প্রচলিত। আমরা মনে করি, একদা নদীয়ার বেণীপুতুলনাচেও পশুপাখিকে পাত্রপাত্রী করে ঘটনার মধ্যে দিয়ে লোকশিক্ষার জন্য অন্তর্নিহিত নীতিকথা বোঝানো হত দর্শকদের কাছে।

ড. সনৎকুমার মিত্র (১৯৩৩-) তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের পুতুলনাচ' গ্রন্থে লিখেছেন (পৃষ্ঠা ১৩) : 'পুতুল অর্থে প্রতিমূর্তি এবং এই প্রতিমূর্তি দেব-দৈত্য নর-পশুর।'

রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০) 'চলন্তিকা' অভিধানে পুতুল অর্থে মানুষ জন্তু ইত্যাদির মূর্তি বলে উল্লেখ করেছেন।

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ-পূর্বাঞ্চল চক্র (Archaeological Survey of India--Eastern Circle) নদীয়া জেলার নবদ্বীপ থানার বামনপুকুর বাজার সংলগ্ন বল্লালঢিপি প্রত্নস্থলে আধুনিক প্রত্নবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে উৎখনন করেছেন। উন্মোচিত মূল গঠনস্থাপত্যের শৈলী ত্রিরথ সর্বতোভদ্র বৌদ্ধস্তূপের মতো, পরবর্তীকালে একই গঠনরীতিতে পঞ্চরত্ন ব্রাহ্মণ্য দেবালয়ে পরিণত করা হয়েছে। এখানে প্রাপ্ত প্রত্নদ্রব্যের মধ্যে উল্লেখ্য হল চুনবালির তৈরি (Stucco) উন্নত শিল্পধারার দেবদেবীর ও দৈত্যের অসামান্য মূর্তিমুখ ও ফুলকারি অলঙ্করণ। দেবদেবীর মানবিক মুখমণ্ডল লালিত্যে-সুষমায়-ব্যঞ্জনায় ভাস্বর। দৈত্যমুখ আসুরিক ভয়ঙ্কর। উদ্ধত গোলাকার চক্ষু-বীভৎস ভীষণ মুখমণ্ডল। এই মূর্তিমুখগুলি বেণীপুতুলনাচের মূর্তিমুখের মতো, আকার-আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। বেণীপুতুলনাচই নদীয়ার আদি পুতুলনাচ। বল্লালঢিপি প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত প্রায় হাজার বৎসর পূর্বেকার এই মূর্তিমুখের সঙ্গে নদীয়ার বেণীপুতুলনাচের সংযোগ আছে কি না—প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু একথা ভাবা যেতে পারে যে হাজার বছর আগে নদীয়ায় বেণীপুতুলনাচ প্রচলিত থাকলে সেই বেণীপুতুলনাচের পুতুলের মুখ চুনবালিতে তৈরি (Stucco-modelling) হত।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র (বঙ্কিম অগ্রজ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠপুত্র) শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৮-১৯৪৪) লিখিত 'বঙ্কিম-জীবনী' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র পরিবারের গৃহদেবতা রাধাবল্লভজীউ-এর রথের মেলা প্রসঙ্গে পুতুলনাচের উল্লেখ করেছেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১): 'আগে পুঁতুল নাচের খুব ভাল ব্যবস্থা ছিল। প্রকাণ্ড এক দোচালার মধ্যে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ রকমের পুঁতুল হইত। সীতার বিবাহ, লবকুশের যুদ্ধ, কালীয় দমন, এসব ত ছিলই; তার উপর একটা মোকদ্দমার সঙ ছিল—জজ সাহেব বসেছেন, পেশকার কাগজ পেশ করিয়া দিল, কাঠগড়ায় আসামী থাকিল, সাক্ষীর জবানবন্দী হইল, উকীলের বক্তৃতা হইল, জজ সাহেব রায় দিলেন, আসামীর ফাঁসী শাস্তি হইল, ফাঁসীও হইল। ফাঁসীকাঠে ঝুলিলে আসামীর কাপড়ের ভিতর দিয়া এক রকম পদার্থ বাহির হইতে দেখিয়া ছেলেরা হাসিয়া খুন হইত। আর এক রকম সঙ ছিল—আহ্লাদে পুঁতুল। তার এক গাল হাসি লাগিয়াই আছে। সে হাত পা নাড়ে আর হাসে।'

এই বিবরণ থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা না গেলেও আমরা অনুমান করি যে এই পুতুলনাচ ছিল সেকালের নদীয়ার বেণীপুতুলনাচ। শতাধিক বৎসর পূর্বে চৈত্রের শেষে বা বৈশাখের প্রথমে (দোলপূর্ণিমার এক মাস পরে) কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির চকে বারোদোলের মেলায় বেণী পুতুলনাচ দেখানো হত, এই পুতুলনাচের দল প্রায় একমাস কৃষ্ণনগরে বারোদোলের মেলায় পুতুলনাচ দেখিয়ে যেত নদীয়ার চূর্ণিনদীতীরবর্তী আড়ংঘাটা গ্রামে যুগলকিশোরের

মেলায় জ্যৈষ্ঠমাসে, আবার যুগলকিশোরের মেলায় পুতুলনাচ দেখিয়ে সেই দল যেত নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় রাধাবল্লভ জীউ এর রথের মেলায়। পরে এই পুতুলনাচের দলই নবদ্বীপ-শান্তিপুরে রাসের মেলায় পুতুলনাচ দেখাতো। নদীয়ার সেকালের বেণীপুতুলনাচের দল নদীয়ার বিভিন্ন মেলায় বিশেষত নদীয়ারাজদের প্রবর্তিত মেলায় পুতুলনাচ দেখাতো। প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য যে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-৮২ সাল, রাজত্বকাল ১৭২৮-৮২ সাল) কাঁঠালপাড়ায় রাধাবল্লভ জীউ-এর সেবার জন্য ভূমিদান করেন এবং রাধাবল্লভ জীউ-এর চালারীতির রত্নমন্দির ১৬৭৫ শকে অর্থাৎ ১৭৫৩ সালে নির্মিত হয় (মন্দিরের প্রস্তর প্রতিষ্ঠাফলকে উৎকীর্ণ লিপি অনুযায়ী)। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালেই এই রত্নমন্দির নির্মিত হয় এবং তৎপর রথের মেলা প্রবর্তিত হয়।

কৃষ্ণনগরে বারোদোলের মেলায় আহ্লাদে পুতুলের নাচও দেখানো হত বলে প্রবীণেরা স্মৃতিচারণ করে থাকেন। রাধাবল্লভ জীউ-এর রথের মেলাতেও আহ্লাদে পুতুল থাকত বলে বিবরণে জানা যাচ্ছে। এ কারণেই আমরা মনে করি কাঁঠালপাড়ার রথের মেলার পুতুলনাচ ছিল নদীয়ার সেকালের বেণীপুতুলনাচ।

'আহ্লাদে পুতুল'-এর অভিধানিক অর্থ : শিশুর খেলনা হাসিহাসি মুখ স্থূলোদর রঙ-করা মাটির পুতুল। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা আজও 'আহ্লাদে পুতুল' (পুরুষ) ও 'আহ্লাদী পুতুল' (নারী) তৈরি ও বিক্রয় করেন। তবে পুতুলনাচে বড় আকারের আহ্লাদে পুতুল দেখানো হত সেকালে মূল পুতুলনাচের পালা শুরুর আগে, দর্শকদের বিশেষত শিশুদের চুপ করার জন্য, গোলমাল থামানোর জন্য।

দেশভাগের আগে নদীয়ার গ্রাম এলাকায় সুতোয় টানা পুতুলনাচ ছিল, কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ-শান্তিপুরে পূজাপার্বণমেলায় দেখানোও হত, বর্তমানে আর নেই, কিন্তু তাদের সঙ্গে আহ্লাদে পুতুল থাকত না।

অনেকে মনে করেন যে ছায়া, বেণী ও ডাঙের পুতুলনাচের চেয়ে সুতোয় টানা পুতুলনাচ প্রাচীন।

দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গের সুতোয় টানা পুতুলনাচের দল নদীয়ার নানা অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন এবং বিগত ৪৮ বৎসরের সাংস্কৃতিক মিলন-মিশ্রণ-সমন্বয়ে নদীয়ার লোকসংস্কৃতির এখন অঙ্গীভূত। তারের পুতুলনাচ নাম হলেও আসলে সুতোয় টানা পুতুলনাচ। মঞ্চের পর্দার পিছনে উপর থেকে সুতোয় পুতুল ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে হাতে টেনে পুতুলনাচ দেখানো হয়ে থাকে। নদীয়া জেলার মূলত হাঁসখালি ও রাণাঘাট থানার কয়েকটি গ্রামেই এই পুতুলনাচের লোকশিল্পকর্ম প্রতিষ্ঠিত। বাংলার অন্যত্র কোথাও এত অধিক সংখ্যক পুতুলনাচের দল একই অঞ্চলে নেই। হাঁসখালি থানায় বগুলা, মুড়াগাছা কলোনী, হলদিপাড়া, গৌরনগর, পূর্বপাড়া, ভবানীপুর, শিবচন্দ্রপুর, মিলননগর, দুর্গাপুর, কৈখালি ও রামদুলালপুরে মোট ৩১ টি পুতুলনাচের দল আছে এবং রাণাঘাট থানায় বড়বেড়িয়া কলোনী, দত্তপুলিয়া,

ববণবেড়িয়া, রাধাকান্তপুরে মোট ৩৭টি পুতুলনাচের দল আছে। একসময় শতাধিক পুতুলনাচের দল নদীয়ায় ছিল। এক কালে বিচ্ছিন্নভাবে নবদ্বীপ, কৃষ্ণগঞ্জ, আস্নাননগর ও তেহট্টে পূর্ববঙ্গাগত সুতোয় টানা পুতুলনাচ ছিল। মোটামুটি নদীয়ার এই পুতুলনাচের দলগুলি ৬০ রকমের পৌরাণিক সামাজিক পুতুলনাচের পালা বছরে পরিবেশন করে থাকে। দেশভাগের পর হাঁসখালি থানার বগুলার অদূরে মুড়াগাছা গ্রামে পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুরা বসতি স্থাপন পত্তন করেন, গ্রামের নাম হয় মুড়াগাছা কলোনী। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন পূর্ববঙ্গের পুতুলনাচের দলের সঙ্গে যুক্ত। এখানেই অনিল মিস্ত্রী, জীতেন হালদার ও প্রয়াত নীলকান্ত চক্রবর্তী প্রমুখেরা ব্যবসাভিত্তিতে গড়ে তোলেন 'ভারতমাতা পুতুলনাট্যসমাজ।' ক্রমে অন্যান্য দল অল্পদিনের মধ্যেই গড়ে ওঠে।

পুরুষানুক্রমিক অভিজ্ঞতার ও নিপুণতার শিক্ষায় এই পুতুলনাচের লোকশিল্পীদের দক্ষতা অর্জিত হয়। সুতোয় টানা 'তারের পুতুলনাচ' সুলভে জনগণের মনোরঞ্জনের লোকায়ত মাধ্যম এবং লোকশিক্ষার জনপ্রিয় শক্তিশালী মাধ্যম। অসামান্য দক্ষতায় শিল্পীরা মঞ্চে পুতুলকে যেন জীবন্ত করে তোলেন।

নদীয়ার তারের পুতুলনাচের দলগুলি বর্ষার চার মাস বাদে বছরের মোটামুটি আটমাস প্রায় ৬০টি রকমারি কাহিনীনির্ভর পালা সমগ্র পূর্বভারতে পরিবেশন করে থাকে। অধিকাংশ পালার কাহিনী পৌরাণিক, রামায়ণীয় ও মহাভারতীয়। ঐতিহাসিক কাহিনীর পালা ও চিরায়ত লোকগাথা নির্ভর পালার আখ্যানও হয়ে থাকে। এছাড়া, সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাও স্থান পায় পুতুলনাচের পালায়। অধুনা কলকাতার যাত্রাদলগুলির বিভিন্ন গণমাধ্যমে বহু বিজ্ঞাপিত-প্রচারিত ও বাণিজ্যসফল যাত্রাপালা পুতুলনাচের পালায় গুরুত্ব পেয়ে থাকে। আবার, জনসমাদৃত বাংলা হিন্দী ফিল্মের নামে ও কাহিনীতে পালা হয়ে থাকে। তবে, পৌরাণিক কাহিনীর পালা বা উপজীব্য বিষয় জনরঞ্জনে তুলনামূলকভাবে সফল হয়। এক একটি তারের পুতুলনাচের দল নানা ধরণের কাজের জন্য ১৫ থেকে ২০ জন শিল্পীকর্মী সমন্বয়ে গঠিত হয়। অপার বিস্ময়ের ব্যাপার যে শুধুমাত্র নদীয়া জেলার হাঁসখালি-রাণাঘাট থানার ঐতিহ্যবাহী সনাতনী এই তারের পুতুলনাচের লোকশিল্পীকর্মী উপনিবিষ্ট প্রায়সংলগ্ন গ্রামসমূহে আনুমানিক দশ হাজার মানুষ এই লোকশিল্পকর্মের উপরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল এবং তাঁরা প্রায় সকলেই দারিদ্র্যসীমার নিচের তফসিল সম্প্রদায়ভুক্ত জাতির মানুষ। নানা সমস্যাদীর্ণ এই তারের পুতুললনাচের শিল্পীকর্মীরা সবার অলক্ষ্যে নীরবে নিভৃতে লোকসংস্কৃতির অঙ্গ পুতুলনাচ লোকনাট্যচর্চায় নিরত আছেন।

তারের পুতুলনাচের পুতুল শিল্পীরাই তৈরি করেন। উচ্চতায় সাধারণত তিনফুটের বেশি হয় না। পুতুলের মাথামুখ ও দেহাংশ তৈরি হয় ফুলশোলা কেটে জমিয়ে বা জোড়া দিয়ে। মাটির লেই, ছেঁড়া পুরানো কাপড়ের নেকড়া ও কাগজের টুকরোও ব্যবহৃত হয়। পুতুলগুলির দুই হাত থাকলেও পা নেই। এমনভাবে পোশাক-পরিচ্ছদ পরানো থাকে বা ঝুলিয়ে দেওয়া

হয় যে পা দেখবার সুযোগ নেই বা পা নেই তা বোঝাও যায় না। ফুলশোলা জুড়ে চরিত্র অনুযায়ী মুখমণ্ডল তৈরি করে সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে মসৃণ করা হয়, তার উপরে দেওয়া হয় রঙ আর ঘামতেল। ডাকের সাজেও পুতুলকে সজ্জিত করা হয়। পরানো হয় পুঁতির মালা, দুল, চুড়ি, নথ প্রভৃতি নকল গহনা আর জরি সিলকের রংবেরঙের বাহারি পোশাক। প্রত্যেকটি পুতুলে মোটামুটি চারটি মোটা সুতো যুক্ত থাকে। উপর থেকে সুতোয় নিচে ঝুলিয়ে শিল্পীরা পুতুল নাচান বা পুতুল নিয়ন্ত্রণ করেন। দুই হাতের সঙ্গে যুক্ত সুতো নিয়ন্ত্রণ করে দুই হাত ওঠানামা করে বা হাতের কাজ দেখানো হয়। পুতুলের দুই হাতের কনুই ভাঁজ হতে পারে। কিন্তু পুতুলের ঘাড় বা কাঁধ স্থির, তাই কোনদিকেই ঘোরানো বা নাড়ানো যায় না। দুটি সুতো লাগানো থাকে পুতুলের দুই কানের পাশে এবং আর দুটি সুতো পুতুলের দুই হাতের কবজির কাছে। এই চারটি সুতো যুক্ত থাকে ক্রুশ বা যোগচিহ্নের মতো চারমুখো লাঠির সঙ্গে। এই চারমুখো লাঠির মাঝখানে ধরে পুতুল নাচানো হয়। পুতুল-নাচিয়েরা দুই হাতে একসঙ্গে দুটি পুতুল নাচাতে পারেন। কেউ কেউ কৌশলে একসঙ্গে তিনটি পুতুলও নাচাতে পারেন।

বেণীপুতুলনাচ সাধারণভাবে এখন মঞ্চে দেখানো হয় না। একজন লোকশিল্পী মুখে গান করেন, দুই হাতে দুটি পুতুল নিয়ে নাচিয়ে থাকেন। দাঁড়িয়ে বা বসে এই পুতুলনাচ দেখানো হয়। লাঠি বা ডাঙের পুতুলনাচে মঞ্চের নিচে থাকেন পুতুলনাচিয়েরা। সুতোয় টানা পুতুলনাচে ঠিক তার বিপরীত। উপর থেকে সুতোয় পুতুল ঝুলিয়ে মঞ্চে পুতুল নাচান হয়। শিল্পীরা দাঁড়িয়ে পুতুল নাচান। সুতোয় টানা পুতুলনাচে থাকে ত্রিমাত্রিক মঞ্চ। সাত ফুট লম্বা, ছয় ফুট উঁচু ও তিনফুট গভীর এই মঞ্চের মাঝখানে তিনফুট উচ্চতায় থাকে পাটাতন। এই পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে পুতুল নিচের মঞ্চাংশে ঝুলিয়ে নাচানো হয়। পাটাতন বেঞ্চি বা চৌকিও হতে পারে। পাটাতনের নিচের মঞ্চাংশে পুতুলনাচ দেখানো হয়। বাকি অংশ কালো কাপড়ে বা পর্দায় ঢাকা থাকে। তাই পুতুলনাচের সময় পুতুলগুলির নাচ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। নিচের মঞ্চাংশে পিছনে পালা অনুযায়ী পর্দা বা দৃশ্যপট ব্যবহার করা হয়। তবে বহু চরিত্রবিশিষ্ট পালায় বা একই দৃশ্যে বহু চরিত্র থাকলে মঞ্চ লম্বায় বাড়াতে হয়। দর্শকেরা মঞ্চের সামনে চট বিছিয়ে বসে দেখেন। আজকাল বেঞ্চি ও চেয়ারের আসনও থাকছে। মঞ্চের বা দর্শকাসনের উপরে চটের বা পলিথিনের আচ্ছাদন থাকে। পুতুলনাচ দর্শনী নিয়ে সর্বত্রই ব্যবসাভিত্তিক দেখানো হয়। দর্শনী বা টিকিটের মূল্য পঞ্চাশ পয়সা থেকে একটাকা। চেয়ারের আসন এক টাকা হয়ে থাকে। চটে এখন অনেকে বসতে চায় না। চেয়ারবেঞ্চি থাকলে দর্শকও বেশি হয়। শহর বা উপশহর এলাকায় চেয়ারবেঞ্চির আসন না থাকলে দর্শক কম আসে। প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য যে এখন গ্রামাঞ্চলেও প্রবীণেরা ভিন্ন সকল পুরুষই ফুলপ্যাণ্ট পরে থাকে, ফলে চটের আসনে তাদের বসতে অসুবিধা হয়।

নদীয়া সুতোয় টানা 'তারের পুতুলনাচ'-এর প্রত্যেকটি দলের শিল্পীকর্মী বিন্যাস ও মাসিক আয়ব্যয়ের মোটামুটি হিসাব :

শিল্পীকর্মী	সংখ্যা	মাসিক পারিশ্রমিক	
১। গায়ক (মাস্টার/হরবোলা)	১	১২০০.০০	
২। সঙ্গতকার (তবলা)	১	৪০০.০০	
৩। জুড়িদার (করতাল ইত্যাদি)	১	২৫০.০০	
৪। বাঁশি	১	৩৫০.০০	
৫। পুতুলনাচিয়ে	২	৮০০.০০	(৪০০.০০X২)
৬। টিকিটবিক্রেতা	২	৬০০.০০	(৩০০.০০X২)
৭। প্রবেশদ্বাররক্ষক	২	৪০০.০০	(২০০.০০X২)
৮। সাইডম্যান (নাচিয়েদের সহযোগী)	২	৩০০.০০	(১৫০.০০X২)
৯। ম্যানেজার	১	৫০০.০০	
১০। রাঁধুনী	১	৩০০.০০	
১১। মাইকম্যান	১	৪০০.০০	
	মোট১৫ জন	৫৫০০.০০	
	বিবিধ খরচ	৫০০.০০	
		৬০০০.০০	

যদি মাসে ২৫ দিন পুতুলনাচ দেখানো হয়, পঞ্চাশ পয়সার টিকিট ধরে প্রতিদিন ৪০০ জনের (এক বা একাধিক বারে) টিকিট বিক্রয় হয়, তবে ৪০০ X পঞ্চাশ পয়সা = ২০০.০০ X ২৫ দিন = ৫০০০.০০ টাকা পাওয়া যায়, তাহলে আর্থিক ক্ষতি হয় এক হাজার টাকা। যদি ৫০০ জনের টিকিট বিক্রয় হয়, ৫০০ X ২৫ দিন = ৬২৫০.০০ টাকা, তাহলে মাসে ২৫০.০০ টাকা লাভ হয়। এই হিসাব নমুনামাত্র। বাস্তবে অনেক হেরফের হয়।

নদীয়ার তারের পুতুলনাচের প্রত্যেকটি দলে মাস্টারের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, যেন তিনিই দলের প্রাণ, দলের রক্ত। সমগ্র পালা থাকে তাঁর কণ্ঠস্থ-মুখস্থ। পালার স্ত্রী-পুরুষ বয়সনির্বিশেষে সকল চরিত্রের ভূমিকার পাঠই তিনি একা বলে যান, নানা কণ্ঠস্বরে পরিবেশন করেন। আবার পালার সব গানও তিনিই করেন। তিনি হরবোলাও, মুখে হরেক রকম বোল তাঁকেই করতে হয়। তাঁকে পুতুলনাচের পালা ও পালার গান রচনা করতে হয়, সুর দিতে হয়, আবহসুরশব্দ সৃষ্টি করতে হয়। তাই তারের পুতুলনাচের দলে মাস্টারের দায়িত্ব-কর্তব্য সর্বাধিক, মূলত তাঁর উপরেই পুতুলনাচ পরিবেশন নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে। এ কারণেই মাস্টারের পারিশ্রমিক দলে সবচেয়ে বেশি। অনেক সময় মাস্টারের সঙ্গে গানে সহ-গায়ক বা দোহার থেকে গানের ধুয়া ধরেন। দলে হারমোনিয়াম, বাঁয়া-তবলা,

আড়বাঁশি, খঞ্জনি-করতাল এমন কি কর্ণেট, ক্লারিওনেট ও বেহালাও থাকে। জামপাতার দুই টুকরো ঠোঁটে চেপে রেখে ফুঁ দিয়ে কেউ কেউ অনবদ্য পাতার বাঁশিও বাজাতে পারেন। তবে সাধারণত আড়বাঁশি ব্যবহৃত হয়।

দলে দুইজন পুতুলনাচিয়ে থাকেন। চরিত্র বেশি হলে নাচিয়ে বেশি থাকেন। পুতুলনাচের দলে ম্যানেজারের ভূমিকা হল যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা করা, দলের সব রকমের দায়দায়িত্ব তাঁকেই পালন করতে হয়। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে দলের মালিকই হন ম্যানেজার। প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য যে নদীয়ার তারের পুতুলনাচের অধিকাংশ দলই ব্যক্তিমালিকানায় চলে। সমষ্টিগত মালিকানায় নদীয়ার তারের পুতুনলনাচের দল চলে না। এমন কি আজ পর্যন্ত সমবায় ভিত্তিতে নদীয়ায় কোনো পুতুলনাচের দল গড়ে ওঠে নি। সমবায় ভিত্তিতে পুতুলনাচের দল গঠিত হলে রাজ্য সরকারের সমবায় দপ্তর থেকে বা সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে বা অন্য সূত্র থেকে অর্থ ঋণ পাওয়া যেত, ফলে সেই পুতুলনাচের দল সমৃদ্ধ হত। নদীয়ার ব্যক্তিমালিকানাধীন তারের পুতুলনাচে একজন পুঁজি-মূলধন বা অর্থ বিনিয়োগ করে দলগঠন করেন। লাভক্ষতি তাঁর ব্যক্তিগত। উল্লেখ্য যে দলের আর্থিক লাভ হলে সেই অর্থ শিল্পী-কর্মীরা ভাগ পান না। কিন্তু আর্থিক ক্ষতি হলে শিল্পীকর্মীরা উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অর্থ থেকে বঞ্চিত হন। তাছাড়া, মালিকানা বদল হলে একজনের মালিকানার হাত বদল হয়ে অন্য নতুন একজন মালিক হলে পারিশ্রমিক কমে যায়, বকেয়া প্রাপ্য থেকেও শিল্পীকর্মীরা নিদারুণ ভাবে বঞ্চিত হন। কারণ লাভজনক পরিস্থিতিতে মালিকানা বদল হয় না, বদল হয় যখন পুতুলনাচের দলের আয় কমে যায়। একবার অর্থ বিনিয়োগ করে পুতুল তৈরি করে পুতুলনাচের দল গঠনের পর প্রায় আট মাস পুতুলনাচ নানা স্থানে দেখানোর পর ফিরে এসে বসে থাকে বর্ষার চার মাস। চার মাস পর এই পুতুলনাচের দলকে বাইরে দেখানোর জন্য পাঠাবার আগে আবার অর্থ বিনিয়োগ করে পুতুলের রঙ করতে হয়। পুতুলের সাজপোশাক পালটিয়ে নতুন সাজপোশাক পরাতে হয়, নতুন করে পুতুলকে সাজাতে হয়। অনেকেই দ্বিতীয় বার বা বার বার অর্থ বিনিয়োগ করতে চান না। পুরানো পুতুল নিয়ে দল বাইরে দেখানোর জন্য পাঠালে সেই পুতুলনাচের দলের বাণিজ্যিক সাফল্য আসে না, দলের লোকসান হয়। তখনই মালিকানার হাতবদল হয়। আবার, প্রথমবার আর্থিক লাভ হলেও অনেকে পুতুলনাচের দলকে আরও সমৃদ্ধ-উন্নত করবার জন্য অর্থ বিনিয়োগ করেন না, কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করেন না। একবার পুতুলনাচের দলের আর্থিক ক্ষতি হলে, সেই দলের মালিক ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে পরের বার নতুন উদ্যমে পুতুলনাচের দল সংগঠিত করেন না, হতাশায় ভেঙে পড়ে চুপচাপ বসে থাকেন বা দলের পুতুলগুলি সহ সরঞ্জামাদি বিক্রয় করে দেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে নদীয়ার পুতুলনাচের দলের আর্থিক লাভে বা বাণিজ্যিক সাফল্যে অধিকাংশক্ষেত্রেই সেই পুতুলনাচের দল অধিকতর বা অপেক্ষাকৃত উন্নত হয় না, আবার দলের আর্থিক ক্ষতিতে বা বাণিজ্যিক অসাফল্যেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতার অর্জিত

শিক্ষায় দলকে উন্নত করা হয় না।

পুতুলনাচের পুতুল নিজে কথা বলতে পারে না। নদীয়ার তারের পুতুলনাচের প্রত্যেকটি দলের একজনই (মাস্টার নামে পরিচিত) লোকশিল্পী কথা বলেন অর্থাৎ মঞ্চে পুতুলের কথা বলেন, গান করেন। আবার তিনি একাই প্রতিটি পুতুলনাচের পালার সব পুতুল চরিত্রের কথাই বলেন। ফলে, একজনের কথা শেষ হলে অপর জনের কথা বলা যায়। অনেক দৃশ্যে নাটকীয় মুহূর্তে একজনের কথার সঙ্গে সঙ্গেই বা একজনের কথা শেষ না হতেই আর একজনের কথা থাকে। পুতুলনাচের পালায় তা হতে পারে না। পুতুলনাচের পালা সে ভাবে লেখাও হয় না। অবশ্য একাধিক লোকশিল্পী নেপথ্যে পুতুলের কথা বললে নাটকীয় মুহূর্তে অনুরূপ কথার পিঠে কথা বলা সম্ভব। এ কারণেই পুতুলনাচের পালায় কথা কম, action বেশি। পুতুলনাচের পালা তাই কথার চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি action ভিত্তিক। কিন্তু পুতুলনাচে কায়িক অভিনয়ের তুলনায় বাচিক অভিনয়ের সুযোগ খুবই স্বল্প।

পুতুলনাচে পুতুলের পোশাক পরিবর্তন করা যায় না। একটি পুতুলনাচের পালায় একটি চরিত্রের রূপায়ণে যে পুতুল যে পোশাক পরে মঞ্চে অবতীর্ণ হয়, শেষ দৃশ্য পর্যন্ত তার সেই একই পোশাক থাকে। পোশাকের পরিবর্তন করার প্রয়োজন একান্ত ভাবে হলে সেই মুখায়বয়ের অন্য পুতুল ভিন্ন পোশাকে তৈরি রাখতে হয়, তাকে অর্থাৎ ভিন্ন পোশাকের সেই পুতুলকে মঞ্চে অবতীর্ণ করা যায়। যেমন, পুতুলনাচের একটি পালায় প্রথম দিকের কয়েকটি দৃশ্যে একজন সধবা চরিত্রের পুতুলকে পরবর্তী দৃশ্যগুলিতে তাকে পালার ঘটনা অনুযায়ী বিধবার বেশে দেখানো যায় না। নতুন একটি সেই একই মুখের পুতুলের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ একই চেহারার-মুখের দুটি পুতুলের প্রয়োজন হয়। এক দৃশ্যে এক পুতুলকে সধবার বেশে, পরবর্তী দৃশ্যে অন্য পুতুলটিকে বিধবার বেশে দেখাতে হয়।

আবার ধরা যাক—একটি সামাজিক পুতুলনাচের পালায় সমাজসেবী এক যুবক নায়ককে পথে একলা পেয়ে বিপক্ষ দলের কতিপয় সমাজবিরোধী দুষ্কৃতী একটি দৃশ্যে মাথায় লাঠি মেরে মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছে। এই দৃশ্য এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে : নায়ক একা চলেছেন, পিছনে কয়েকজন দুষ্কৃতী লাঠি নিয়ে আসছে, একজন দুষ্কৃতী লাঠি তুলে মাথায় মারতে উদ্যত, এমন সময় নায়ক মঞ্চ থেকে বেরিয়ে গেছেন, দর্শকেরা তাঁকে আর দেখাতে পারছে না অথচ দুষ্কৃতী পুতুল একেবারে যে পাশে নায়ক চলে গেছেন, সেখানে লাঠির আঘাত করে অদৃশ্য হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গেই নায়কের আর্ত চীৎকার, অন্যান্য দুষ্কৃতী পুতুল সেই দিক দিয়েই মঞ্চ থেকে অদৃশ্য হবে। পরের দৃশ্যেই নায়ককে দেখা যাবে, মাথায় হাতে ব্যানডেজ বাঁধা, তাতে রক্তের দাগ। সঙ্গে নায়কের কয়েকজন সহকর্মী ও তাদের কথোপকথন। এই দুটি দৃশ্যের জন্য একই চেহারার নায়ক পুতুল থাকলেও দুটি পুতুল লাগে। পরবর্তী দৃশ্যগুলিতে পালার প্রয়োজনে নায়কের আর হাতে মাথায় ব্যানডেজ প্রয়োজন না থাকলে আগের নায়ক পুতুলটিকে আবার মঞ্চে আনা যাবে। কিন্তু দুটি পুতুল

অবশ্যই লাগবে। কারণ, নায়কপুতুলকে শারীরিকভাবে আহত নায়কপুতুল সাজানো যায় না,আর একটি একই ধরণের চেহারার বয়সের আহত পুতুলের প্রয়োজন হয়। আবার, আহত করার দৃশ্যও মঞ্চে দেখানো যায় না, তাই দৃশ্যটি এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হয়—যাতে দর্শকদের বুঝতে অসুবিধা হবে না যে নায়ক পুতুলটিকে লাঠি মেরে আহত করা হচ্ছে এবং পরের দৃশ্যে আহত নায়ক-পুতুলকেই দর্শকেরা দেখবে।

তারের পুতুলনাচের পুতুলের গ্রীবা স্থির দৃঢ় সংবদ্ধ বা Fixed অর্থাৎ পুতুলের ঘাড়-কাঁধ নাড়াতে পারা যায় না, ঘোরাতে পারা যায় না। তবে তারের পুতুলনাচের পুতুলের দুই হাতের মধ্যগ্রন্থি বা কনুই মুড়তে পারা যায়, আবার দুই হাতের আঙুল মুড়তে পারা যায় না। পুতুলগুলি পা ফেলে হেঁটে চলে ফিরে বেড়াতে পারে না বা তাদের পা দেখা যায় না। আসলে কোনও পুতুলেরই পা থকে না।

পুতুলনাচের পুতুল নাচানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি দৃশ্যে প্রতিটি পুতুলের রকমারি ভূমিকা, সেদিকে পুতুলনাচিয়েকে লক্ষ্য রাখতে হয়। সুপরিকল্পিতভাবে পুতুল নাচাতে হয়। মঞ্চে শুধুমাত্র পুতুলকে উপস্থিত করলেই হয় না। নির্দিষ্ট পুতুলের কথা যখন মাস্টার নেপথ্যে পিছন থেকে বলেন, তখন সেই নির্দিষ্ট পুতুলই যেন কথা বলছে তা পুতুলনাচিয়েকে পুতুলকে নাড়িয়ে ঘুরিয়ে নাচিয়ে দর্শক শ্রোতাদের বোঝাতে হয়। এ কারণেই পুতুলনাচে মহলা-মহড়ার খুব প্রয়োজন। নিয়মিত অভ্যাসে পুতুল-সঞ্চালনে অভ্যস্ত হতে হয়।

মঞ্চে মানুষের যাত্রা-নাট্যাভিনয়ে বিভিন্ন দৃশ্যে বিভিন্ন চরিত্রে বিভিন্ন দ্রব্যাদি হাতে করে নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করতে হয়। নির্দেশক বা তাঁর সহকারীবৃন্দ এ ব্যাপারে মানুষ-অভিনেতাদের সহযোগিতা করেন, মানুষ-অভিনেতাদের নিজেদের মনে রাখতে হয়—কোন দৃশ্যে কি জিনিস হাতে নিয়ে মঞ্চে যেতে হবে। পুতুলনাচের পালাতেও বিভিন্ন পুতুলচরিত্রের নানা দৃশ্যে দ্রব্যাদি হাতে করে নিয়ে মঞ্চে যেতে হয়। এক্ষেত্রে পুতুলের নিজের কোন ক্ষমতা নেই। পুতুল নাচিয়েকেই মনে রাখতে হয়। মনে করা যাক্ পুতুলনাচের দৃশ্যে একটি পুতুলের হাতে একটি ঝাঁটা থাকবে বা তার দেহ উপযোগী ছোট নকল হারিকেন লণ্ঠন থাকবে, পুতুলনাচিয়েকে লক্ষ্য রাখতে হয় যে সেই দৃশ্যে সেই পুতুলকে লণ্ঠন (ছোট আকারের) লাগিয়ে নিয়ে তবে মঞ্চে সেই পুতুলকে ঢোকাতে হবে। তাই পুতুলনাচের পালায় ব্যবহর্তব্য দ্রব্যাদি বা মঞ্চে পাত্রপাত্রীর আবশ্যক দ্রব্যাদি (Stage Requisites) সম্পর্কে পুতুলনাচিয়েকেই স্মরণ রাখতে হয়।

পুতুলনাচের পালায় পুতুল-নাচিয়েকে লক্ষ্য রাখতে হয় মঞ্চের মধ্যে যেন পুতুলকে বা পুতুলদের ভালভাবে দেখা যায়। পুতুলের মাথা উপরে উঠে গেলে হবে না, আবার খুব ঝুলে গেলেও চলবে না। মঞ্চের একেবারে একধারে চলে গেলে হবে না, তাতে দর্শকদের দেখতে অসুবিধা হয়। মূল কথা হল, মঞ্চে পুতুলকে এমনভাবে সঞ্চালন করতে হয় যাতে দর্শকেরা পুতুলকে সম্পূর্ণভাবে দেখতে পায়।

পুতুলনাচের পুতুলের action-গুলি খুব দ্রুত মঞ্চে দেখানো উচিত নয়। এমন ভাবে

পুতুলের action দেখাতে হয় যাতে দর্শকেরা দেখতে পায়, বুঝতে পারে। আবার, পুতুলের কথার সঙ্গে পাঠ বলার সঙ্গে সামঞ্জস্য সঙ্গতি রেখেই পুতুলের অঙ্গভঙ্গি-অঙ্গসঞ্চালন বা action দেখাতে হয়। দর্শক-শ্রোতারা যাতে পুতুলের কথার ধারা বা সূত্র বা এককথায় খেই হারিয়ে না ফেলে সেদিকে পুতুলনাচিয়েকে নজর রাখতে হয়।

তারের পুতুলনাচের মঞ্চ মানুষের অভিনয়ের মঞ্চের তুলনায় আকারে অনেক ছোট। এই মঞ্চে উপযুক্ত আলোর ব্যবস্থা রাখতে হয়। আলো এমন ভাবে থাকবে না যাতে পুতুলের ছায়ায় মঞ্চ অন্ধকাব হয় বা সেই দৃশ্যের মঞ্চের অন্যান্য পুতুলকে দেখা না যায়। আলোকসম্পাতের দোষে অনেক পুতুলনাচের পালা দর্শকদের কাছে বিরক্তিকর হয়।

পুতুলনাচের পালায় একঘেয়েমি (monotonous) থাকলে চলবে না। পুতুলদের শুধুমাত্র আসাযাওয়া নয়। দর্শকেরা যাতে আগ্রহী ও আকৃষ্ট হয়- সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

মঞ্চে যখন আমরা মানুষের অভিনয় (নাটকে বা যাত্রায়) দেখি, তখন মানুষ হল রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ। কিন্তু পুতুলনাচের পুতুল জীবন্ত নয়, রক্তমাংসের নয়। পুতুলনাচের পুতুল শোলা দিয়ে তৈরি জড় নিশ্চল পদার্থের পুতুল। পুতুলনাচের পুতুলকে দর্শকদের চরিত্র অনুযায়ী কল্পনা করে নেয়—যেন মানুষ। কিন্তু পুতুল কখনই জীবন্ত মানুষের মতো অভিনয় করতে পারে না, মঞ্চে জীবন্ত মানুষও হয়ে ওঠে না। তাই,পুতুলনাচে পুতুলনাচিয়েদের মঞ্চে পুতুলকে এমনভাবে নাচাতে-ঘোরাতে হয় যাতে দর্শকেরা মনে করে কল্পনা করে যে পুতুলটি চরিত্র অনুযায়ীই জীবন্ত অভিনয় করছে। পুতুলনাচিয়েকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কৌশলে হস্তচালনা করতে হয়। পুতুলের সঙ্গে যুক্ত সুতো টানতে হয়। পুতুলনাচিয়েকে পুতুলকে কাল্পনিক প্রাণসঞ্চার করে প্রাণবন্তে রূপান্তরিত প্রতিফলিত করে তুলতে হয়, পুতুলটিকে গতিময় চলনশীল উত্তেজনা উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হয়।

মঞ্চের জীবন্ত মানুষ অভিনেতার সঙ্গে পুতুলনাচের পালার পুতুলের অভিনয়ের মৌলিক পার্থক্য সম্বন্ধে দর্শকেরা সচেতন না হলে চলবে না। মঞ্চে মানুষ যেমন অভিনয় করতে পারে পুতুল তা পারে না, দর্শকদের একথা মনে রাখতে হয়। মঞ্চে মানুষ অভিনেতা একই সঙ্গে একই সময়ে কথা বলতে পারে, নানা অঙ্গভঙ্গি করতে পারে, পুতুল তা পারে না। পুতুলনাচের পালায় পুতুল মঞ্চের জীবন্ত অভিনয়ের সামান্যই অনুকরণ করতে পারে। পুতুলনাচের পুতুল মানুষ অভিনেতার গড়পড়তা অনুকাবকমাত্র। পুতুলের সীমাবদ্ধতা আছে। পুতুলনাচের পুতুলনাচিয়ের পুতুলনাচানোর হাতের কৌশলেই পুতুল জীবন্ত মানুষের মতো প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ বাস্তবময় হয়ে ওঠে। পুতুল মানুষের অনুকরণ যতটা করতে পারে, ততটাই দেখাতে হয় এবং তার উপরেই পুতুলনাচের পালার কাহিনী-দৃশ্য বিন্যাস করতে হয়। পুতুলনাচের পুতুলঅভিনেতা পুতুলনাচিয়ের প্রত্যক্ষ হস্তচালনাধীনে সীমাবদ্ধ, পুতুলের নিজস্ব কোন শক্তি বা ক্ষমতা নেই। পুতুলনাচিয়ের উপরেই পুতুলের অভিনয় সম্পূর্ণভাবে

নির্ভর করে। পুতুলনাচের পুতুলের অঙ্গভঙ্গি, অঙ্গসঞ্চালন ও চলনভঙ্গি (action ও movement) মঞ্চে পুতুলের জীবনীশক্তি, তার সঙ্গে যুক্ত হয় আবহ শব্দ, পুতুলের কথা ও গান ইত্যাদি।

তারের পুতুলনাচে সমস্যা হল—যে পুতুল নাচায় সে পুতুলের কথা বলে না বা গান করে না। পুতুলের কথা বলে গান গায় অন্যজন—তিনি হলেন মাস্টার। ফলে, কথা বা গানের সঙ্গে পুতুলের অঙ্গভঙ্গির সঞ্চালন কষ্টসাধ্য। পুতুলনাচের পালায় কথোপকথনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সতর্কভাবেই নিয়ন্তা পুতুলনাচিয়েকে পুতুল নাচাতে হয়, পুতুলকে অভিনয়ে ক্রিয়াশীল করে তুলতে হয়, নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। পুতুলনাচিয়েকে পুতুলের কথার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই পুতুলের প্রতিটি পদক্ষেপ গমনভঙ্গি চলাফেরাগতি দ্রুত ও দৃঢ়ভাবে সঞ্চালন করতে হয়, চরিত্রচিত্রণে উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হয়। পুতুলনাচের পুতুলের অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে তার কথোপকথনের তাৎক্ষণিক প্রতি-মুহূর্তের সমন্বয় সাধন ও কার্যে পরিণত করণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়। এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম বা অন্যথা হলে চলে না। আবার, এক সঙ্গে একাধিক পুতুলকে মঞ্চে সঞ্চালন করলে এই সমস্যা তীব্রতর হয়, তখন খুবই সতর্ক হতে হয়, সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। একসঙ্গে একাধিক বিভিন্ন চরিত্রের বা পুরুষ-নারী চরিত্রের পুতুল নাচানোর সময় কথোপকথনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করা খুবই কঠিন। পুতুলনাচের পুতুল মানুষ নয়। মানুষ যা পারে পুতুল তা পারে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে মানুষ যা পারে না, পুতুল তা পারে। মঞ্চে পুতুলকে দিয়ে অবাস্তব কার্যকলাপও করানো যায়। মঞ্চে পুতুলকে প্রাণবন্ত করে তুলতে হয় পুতুলের নিজস্ব কায়দায় কৌশলে। পুতুলনাচ দর্শকদের কাছে গ্রহণীয় আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে পুতুলনাচিয়েকে পুতুলনাচের মঞ্চে পুতুলকে মানুষ অভিনেতার সাদৃশ্য অনুরূপতা বজায় রাখবার সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হয়, লক্ষ্য রাখতে হয় যে পুতুলনাচের পুতুলের অভিনয় যেন বাস্তবধর্মী বস্তুনিষ্ঠ হয়ে ওঠে, অচেতন পুতুলকে দর্শক-কল্পনায় ক্ষুদ্রাকৃতি মানুষের মতো করে তুলতে পুতুলনাচিয়েকে নির্ভুল যথাযথভাবে কৌশল ও উদ্ভাবনশক্তিতে পুতুল সঞ্চালন করতে হয়। পুতুলনাচানো যেন অর্থবহ চিত্তাকর্ষক হৃদয়গ্রাহী মনোজ্ঞ হয় সেদিকেও পুতুলনাচিয়েকে নজর রাখতে হয়। পুতুলনাচানোর সময় পুতুলনাচিয়েকে মনে রাখতে হবে যে পুতুল চরিত্রের তাৎপর্য যেন অভিন্ন অবিকৃত থাকে, অতিরঞ্জিত না হয় এবং কথোপকথনের প্রকৃত অর্থের ব্যত্যয় যেন না হয়। পুতুল নিজে হাসতে পারে না, কাঁদতে পারে না। অথচ নেপথ্যে পুতুলচরিত্রে মাস্টার হাসবেন, কাঁদবেন। তখন এই হাসা বা কাঁদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সঞ্চালন করতে হয়। পুতুলের চরিত্রানুগ সঞ্চালন সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে হয়। যে চরিত্র রূপায়ণের জন্য পুতুল মঞ্চে আসে সে চরিত্রের কৃত্রিম আচরণ, ভান বা ছলনা পুতুল করতে পারে না। প্রতিটি পুতুলেরই অস্তিত্ব চরিত্রনির্দিষ্ট, তার বাইরে যাওয়া যায় না। পুতুলনাচের মঞ্চে প্রতিটি পুতুলের চরিত্রের সত্তা তার বহিরঙ্গ বা বাহ্যলক্ষণের অচেতন পুতুলত্ব। পুতুলনাচিয়েকে মঞ্চে পুতুলের চরিত্রের অন্তরঙ্গ আভ্যন্তরীণ সত্তার বিকাশ ঘটাতে হয়, সৃষ্টি করতে হয়।

মঞ্চে যখন কোন মানুষ অভিনেতা আসে তখন দর্শকেরা নিশ্চিতভাবে মনে করে বিশ্বাস করে যে সে প্রকৃত মানুষ, মঞ্চে তার উপস্থিতি মানুষ বলেই ধরে নেয়। কিন্তু পুতুলনাচের পুতুলকে দর্শকেরা পুতুল বলেই মনে করে, তাই নাচানোর কৌশলে পুতুলের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

পুতুলনাচ সহজ সরল স্পষ্ট অনুষ্ঠান হলেও তার রূপায়ণ সহজ অনায়াসসাধ্য নয়। বারবার মহলায়, অভিজ্ঞতায় অর্জিত জ্ঞানে শিক্ষায় চেষ্টায় অধিগত ও সফল হওয়া যায়।

যে মঞ্চে পুতুলনাচ দেখানো হয় তার আকারের সঙ্গে পুতুলের আকৃতি ও নাচানো পুতুলের সংখ্যা নির্ভরশীল। ছোট মঞ্চে বেশি সংখ্যক পুতুল দেখানো যায় না, ছোট মঞ্চে বিরাটাকৃতি পুতুল নাচানো যায় না। মঞ্চে একাধিক পুতুল থাকলে তাদের action-এ বা সঞ্চালনে দর্শকদের বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। তাই মঞ্চে একাধিক পুতুল থাকলে একসঙ্গে তাদের action দেখানো যায় না, পর্যায়ক্রমিক দেখালে দর্শকদের বুঝতে সুবিধা হয়।

নদীয়ার তারের পুতুলনাচ শিক্ষাপ্রদ, লোকরঞ্জক ও বাণিজ্যিক। এই পুতুলনাচ বয়সনির্বিশেষে সকলের কাছেই আকর্ষণীয়।

মানুষের অভিনয়ের নাট্যদল-যাত্রাদলের তুলনায় নদীয়ার তারের পুতুলনাচের মঞ্চসহ অন্যান্য উপকরণ ও সরঞ্জাম তুলনামূলকভাবে লঘু, হালকা, সহজ-স্বচ্ছন্দ বহনযোগ্য। পুতুলনাচের দলে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাও বেশি নয়। কেউ কেউ লজ্জায় সংকোচে মঞ্চে অভিনয় করতে পারেন না, কিন্তু তিনি পুতুলনাচের পুতুলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন অর্থাৎ মঞ্চের পিছনে নেপথ্যে পুতুলের অভিনয়ের কথোপকথন বলতে পারেন। কারণ তাঁকে সশরীরে মঞ্চে অবতীর্ণ হতে হয় না, মঞ্চের পিছনে তাঁকে শ্রুতি-অভিনয় করতে হয়। তাঁকে দর্শকেরা দেখতে পান না, অথচ তাঁর কথা বা গান পুতুলের মাধ্যমে শ্রোতারা শুনতে পান।

মানুষের মঞ্চঅভিনয়ের অনুষ্ঠানের তুলনায় পুতুলনাচের পালার অনুষ্ঠানে ব্যয়ও স্বল্প।

পুতুলনাচের মঞ্চে দর্শকশ্রোতারা শুনতে পায় মানুষের কণ্ঠস্বর, দেখতে পায় পুতুলের action বা সঞ্চালন। মানুষের মঞ্চ-অভিনয়ে কুশীলবের পাঠ মুখস্থকণ্ঠস্থ করতে হয়, স্মরণে রাখতে হয় প্রতিটি পদক্ষেপ। কিন্তু পুতুলনাচে পাণ্ডুলিপি দেখেও পালার নানা চরিত্রের পাঠ বলা যায়। অবশ্য বাস্তবে,তারের পুতুলনাচে মাস্টারের (যিনি নেপথ্যে পুতুলের পাঠ বলেন, গান করেন) সমগ্র পালা মুখস্থই থাকে, পাণ্ডুলিপি দেখে বলতে হয় না। অসামান্য দক্ষতায় মাস্টাররা নানা বয়সের নারী-পুরুষের কণ্ঠস্বর প্রক্ষেপ করেন, অপার বিস্ময়ের ব্যাপার।

পুতুলনাচের পালাও মিলনান্ত, বিয়োগান্ত, হাস্যোদ্দীপক হতে পারে। মানুষের মঞ্চনাটকের মতো পুতুলনাচের পালায় নানা নাটকীয় উপাদান থাকতে পারে। কিন্তু মানুষের মঞ্চঅভিনয়ে মানুষঅভিনেতার মতো পুতুলনাচে মঞ্চে পুতুলঅভিনেতা মনের ভাব বা mood

প্রকাশে অক্ষম, সব রকমের actionও দেখাতে পারে না, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করতে পারে না। পুতুল অভিনেতার সীমাবদ্ধতা আছে। পুতুলনাচে পুতুলের মুখের অভিব্যক্তি (facial expression) অপরিবর্তনীয়। মানুষের মঞ্চঅভিনয়ে অভিনেতা তাঁর কথার সঙ্গে বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য সঙ্গতি রেখে মুখের অভিব্যক্তি দেখাতে পারেন, পুতুলনাচের পুতুল তা পারে না। পুতুলপালায় পুতুল মুখের অভিব্যক্তি দেখাতে অক্ষম। পুতুলের সঞ্চালনেও সীমাবদ্ধতা আছে, পুতুলের বেশি অঙ্গভঙ্গিও দেখানো যায় না। তদুপরি, পুতুলের পোশাকেরও পরিবর্তন করা যায় না।

পুতুলনাচ মূলত দর্শকশ্রোতাদের আনন্দদানের জন্য পরিবেশিত হয়। পুতুলনাচ উদ্দেশ্যমূলক হতে পারে। যেমন, পুতুলনাচে পরিবার কল্যাণ বিষয়ে উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তবে, এই উদ্দেশ্য সরাসরি থাকবে না। পুতুলনাচের পালার নাটকীয় ঘটনার মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য তুলে ধরতে হবে। ঘটনা এমন হবে যাতে দর্শকশ্রোতারা বুঝতে পারে পরিবার কল্যাণের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব। সরাসরি উদ্দেশ্য দেখালে বা বক্তৃতামূলক হলে, দর্শকেরা গ্রহণ নাও করতে পারে। পুতুলনাচে তত্ত্বকথার শুধু বক্তৃতা কখনই থাকেব না। পুতুলনাচের পালার সুবিধা হল, স্বল্পসংখ্যক দর্শকের সামনেও পরিবেশিত হতে পারে। তাই পুতুলনাচ আজও আকর্ষণীয় দৃশ্যশ্রাব্য (andio-visual) লোকরঞ্জক মাধ্যম।

নদীয়ার তারের পুতুলনাচের পুতুলের মুখ পুতুল পালার বিভিন্ন চরিত্রানুগ তৈরি করা হয়। যেহেতু পুতুলের চোখ স্থির, সেহেতু চরিত্র অনুযায়ী চোখ বা চোখের দৃষ্টি তৈরি করতে হয়। শুধু চোখ নয়, নাক ও কণ্ঠদেশও চরিত্রানুগ হয়। সামাজিক পালায় এক লম্বা গলার মাথায় টাক উন্নত নাক লম্বা গোঁফের পুতুল মঞ্চে এলেই দর্শকেরা সহজেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তার কণ্ঠস্বর বিচিত্র হলে আরও ভাল হয়। আবার, এই চরিত্রটি তোতলা হলে দর্শকেরা মজা পায়—যখনই সে মঞ্চে আসে। প্রতিটি পুতুল নাচানোর বা সঞ্চালন করবার সময়ও চরিত্রানুযায়ীই করতে হয়। চরিত্রের প্রতিফলন পুতুলের চলাফেরায় দেখাতে হয়। দর্শকেরা পুতুলের নাচানোতেই পুতুলের চরিত্র বুঝতে যেন সক্ষম হয়, চরিত্র দর্শকদের মনে যেন রেখাপাত করে। পুতুলনাচে দর্শকদের কথা ভুলে গেলে চলবে না,দর্শকদের মনে রাখতে হয়। কোন পুতুলের সঞ্চালন দর্শকদের মনে ধরলে, সেই সঞ্চালনের উপর গুরুত্ব দিতে হয়। নাচানোতে দর্শকদের ধরে রাখার কৌশল অধিগত আয়ত্ত করতে হয়। পুতুলনাচে পুতুলের নাচানোর কলাকৌশল-আঙ্গিকশৈলীই মুখ্য।

পুতুলনাচে পুতুলের সামনের মুখ দেখাতে হয়। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে পাশের মুখ দেখানো যায় না। নদীয়ার তারের পুতুলনাচের প্রবীণ লোকশিল্পী জীতেন হালদার আমাকে বলেছিলেন যে পুতুলনাচের পালায় যে পুতুল সৎ বা ভালো মানুষের ভূমিকায় মঞ্চে অবতীর্ণ হয়, তার চোখ বড় আকারের করতে হয়, টানা টানা চোখ করতে হয়। আবার যে পুতুল অসৎ বা খারাপ মানুষের ভূমিকায় মঞ্চে অবতীর্ণ হয়, তার চোখ ছোট আকারের করতে হয়, চোখ দুটি যেন চোখের গর্তের মধ্যে আছে, চোখ দেখেই দর্শকেরা

বুঝতে পারে যে এই চরিত্রের পুতুল খারাপ লোক। তিনি আরও বলেছিলেন যে মঞ্চে একাধিক পুতুলের চলাফেরার সময় খুব সাবধানে সঞ্চালন করতে হয় যাতে দর্শকদের বুঝতে অসুবিধা না হয়। পুতুলনাচের সামাজিক পালায় সুবিধা হল বিভিন্ন অদ্ভুত দর্শন মুখের পুতুল রাখা যায় কিন্তু ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক পালায় তা করা যায় না। অবশ্য রামায়ণীর পালায় দশমুখ রাবণের পুতুলচরিত্র দর্শকদের রাবণ বলে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না।

পুতুলের পোশাক নানা রঙের আকর্ষণীয় করতে হয়। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক-পৌরাণিক পালায় সুবিধা আছে, যেমন-রাজারাণী, বাদশা-বেগম চরিত্রের পুতুলের পোশাক রঙ-বেরঙের পোশাক-পরিচ্ছদে আকর্ষণীয় করা যায়।

তারের পুতুলনাচে মঞ্চের পিছনের পর্দা থেকে প্রায় ছয় ইঞ্চি দূরত্বে পুতুল সঞ্চালন করতে হয়। পুতুল নাচিয়েকে পুতুলনাচানোর সময় তার সমস্ত মনপ্রাণ-নজর পুতুলের উপর রাখতে হয়। মঞ্চের পুতুল পুতুলনাচিয়ের মন-প্রাণ নজর দর্শকদের উদ্দেশ্যে ঢেলে দেয়।

নদীয়ার তারের পুতুলনাচের পুর্ণাঙ্গ একটি দলের সরঞ্জাম: রকমারি পুতুল, মাইক, ঢোল, সানাই, কাঁসি, বাঁশি, হারমোনিয়াম, মাইক্রোফোন, লাইট, জেনারেটর, হ্যাজাক, বেড়ার কাপড়, ত্রিপল, চাঁদোয়া, সামিয়ানা, চট, বাউটি (কাঠের বেড়া), দৃশ্যপট, মঞ্চ, রেলিং, তক্তা, তারকাঁটা, চেয়ার, টেবিল, কাঠ, বাক্স, বাঁশ, ম্যাটাডোর ভ্যান, পালার মুদ্রিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি।

নদীয়ার বর্তমান তারের পুতুলনাচের লোকশিল্পীরা সকলেই পূর্ববঙ্গাগত। বৃদ্ধেরা অবিভক্ত বাংলায় পুতুলনাচ দেখাতেন, অনেকেরই কমপক্ষে পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা আছে বা ছিল। নদীয়ার তারের পুতুলনাচের প্রবীণ লোকশিল্পীদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি পঞ্চাশ বছর আগেকার পুতুলনাচের নানা তথ্য। সেকালে পুতুলনাচের পালায় কথোপকথনে ভাষায় আড়ম্বর ছিল না, তাঁরা আড়ম্বর সৃষ্টি করার চেষ্টাও করতেন না। তাঁরা সহজ সরল ভাষায় পালা লিখতেন, সামাজিক পালায় তৎকালে প্রচলিত মানুষের মুখের ভাষাই ব্যবহার করতেন। কোন রকম জটিলতার আশ্রয় তাঁরা নিতেন না। তাই বলে, তাঁদের ভাষা নিম্নমানের ছিল না, ছিল না গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট বা কদর্যরুচিপূর্ণ-অরুচিকর। ভাষায় সুরুচি ছিল। সহজ সরল ভাষা হলেও ভাষার শক্তি ছিল, শ্রোতারা আকৃষ্টও হত। সেকালে পুতুলনাচের পালা ছিল সঙ্গীত নির্ভর ও গীতিনাট্য, সেকালের যাত্রাথিয়েটারের মতো পদ্যবন্ধ ছিল—ছন্দের মিল থাকত প্রতি চরণে। সেকালে পুতুলনাচের দলের মাস্টাররাই পালা লিখতেন—তাঁরা ছিলেন স্বভাব প্রতিভাধর সৃজনশীল—সৃষ্টিসুখের আনন্দে প্রাণিত। তাঁদের প্রথাগত বিদ্যা খুব বেশি না থাকলেও নানা বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান ছিল অসামান্য। পৌরাণিকপালা বিন্যাসে তাঁরা দক্ষতার পরিচয় দিতেন। সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে পালা রচনা ও পরিবেশন করার প্রবণতা তাঁদের ছিল। মাস্টারদের মধ্যে যাঁরা পুতুলনাচের পালা রচনায়-পরিবেশনে খ্যাতি

অর্জন করতেন, তাঁদের দলে তরুণেরা দলভুক্ত হতে চাইতেন। পুতুলনাচের খ্যাতনামা মাস্টারদের জনগণের কাছে পরিচিতি ছিল। তাঁদের নামডাকের আকর্ষণেই তাঁদের পুতুলনাচের পালায় জনসমাগম হত। তাঁরা যেখানেই যেতেন, সেখানেই মানুষের ভালবাসা পেতেন, তাঁদের সম্পর্কে মানুষের কৌতূহলের সীমা ছিল না। তাঁরাও মানুষের সঙ্গে মিশতেন, মানুষের চাহিদার সঙ্গে পরিচিত হতেন। ফলে তাঁরা তৎকালীন সমসাময়িক যুগ মানসিকতা নির্ভর হতেন এবং তদনুযায়ী পুতুলনাচের পালা বারবার পরিবর্তন পরিবর্ধন পরিমার্জন করতেন। স্বাধীনতাপূর্বকালে তাঁরা স্বদেশপ্রাণতায় স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। দেশাত্মবোধক পুতুলনাচের পালাও তাঁরা রচনা ও পরিবেশন করতেন। আবার সামাজিক পালায় তাঁরা তাঁদের বাস্তব জীবনাশ্রয়ী কাহিনীকে স্থান দিতেন, গুরুত্ব দিতেন। যে জীবন তাঁরা দেখছেন, যে সমাজে তাঁদের অবস্থান—তা তাঁরা ভুলে যেতেন না, সমাজের বাস্তব চিত্রই তাঁরা সামাজিক পালায় প্রতিফলিত করতেন। এই ধারাবাহিকতায় এই ধারা আজও পুতুলনাচের পালায় অব্যাহত।

কলকাতার যাত্রাদলের মতো অধুনা নদীয়ার তারের পুতুলনাচের পালার দলেও আছে দলবদল। মাস্টার খ্যাতি অর্জন করলে বা তাঁর অভিনীত পালা জনসমাদৃত হলে নানা দলে তাঁর চাহিদা বাড়ে এবং তাঁর পারিশ্রমিকের মাসিক হারও বেড়ে যায়। ফলে তিনি দলবদল করে নতুন দলে যোগদান করেন। পুতুলনাচের দলগুলির নামকরণও হয় কলকাতার যাত্রাদলের মতো। শুধু পুতুল কথাটি যুক্ত থাকে। যেমন, নবজাগরণ পুতুলনাট্য সমাজ, রাধাশ্রী পুতুলনাট্যসমাজ, নবভারতমাতা পুতুল নাট্যসংস্থা, জয়শ্রী পুতুলনাচ, ভারতেশ্বরী পুতুলনাট্যসমাজ, শ্যামসুন্দর পুতুলনাট্যসমাজ, ভারতময়ী পুতুলযাত্রাসমাজ, মা বিশ্বভারতী পুতুল নাট্য সমাজ, শান্তিমাতা পুতুল নাট্য কোম্পানী, ভুবনেশ্বরী পুতুলনাচ, রাধাকৃষ্ণ পুতুলনাচ, শ্রীদূর্গা পুতুলনাচ, শ্রীশ্রীনটরাজ পুতুলনাট্য সমাজ ও বিশ্বরূপা পুতুলনাট্য কোম্পানী প্রভৃতি।

যেহেতু নদীয়ায় তারের পুতুলনাচের এক একটি দল তাঁদের নিজেদের ঘরসংসার ছেড়ে বছরের মোটামুটি আটমাস দূরদূরান্তরের এলাকায় পুতুলনাচ দেখান, সেহেতু তাঁদের দলে একজন পাচকের প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক দলেই একজন করে পাচক থাকেন, পাচক পুরুষই হন। পুতুলনাচের দলে এই পাচক 'রান্নার ঠাকুর' নামে পরিচিত।

নদীয়ার তারের পুতুলনাচের শিল্পীকর্মীরা সকলেই পেশাদার। প্রায় আটমাস পুতুলনাচের দলের সঙ্গে যুক্ত থেকে অর্জিত অর্থে তাঁরা জীবিকানির্বাহ করেন।

তারের পুতুলনাচ দলগত অনুষ্ঠান। ব্যক্তি শিল্পী বা কর্মী দলের অংশমাত্র। পুতুলনাচের দলগুলি ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক হওয়ায় শিল্পীকর্মীরা মাসিক পারিশ্রমিকভুক্ত। তবে কেউই নিয়োগপত্রে নিযুক্ত হন না, মালিকের মুখের কথাতেই দলের সঙ্গে যুক্ত হন। সকলেই পারিশ্রমিক পান, বেতন পান না, কারণ বেতন দিতে গেলে বেতন-কাঠামোর প্রয়োজন। চুক্তির ঠিকা কাজের মতো শিল্পীকর্মীরা পুতুলনাচের দলে কাজ করেন। পারিবারিক কারণে

বা শারীরিক অসুস্থতা হেতু দল থেকে সাধারণভাবে ছুটি পাওয়া যায় না। পুতুলনাচ দেখানোর আটমাস সময়কালে কেউ ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরলে তার পারিশ্রমিক মেলে না। অনেক দলে দিনমজুরীও আছে অর্থাৎ দিনভিত্তিক পারিশ্রমিক দেওয়া হয়ে থাকে। আবার অনেক দলে দিনমজুরীতে পুতুলনাচ কোনও কারণে না দেখানো গেলে সেদিনের মজুরী মেলে না।

পুতুলনাচের দলে মালিক-কর্মচারী সম্পর্ক প্রশ্নে সাধারণভাবে কোন বিরোধ নেই, কিন্তু সমস্যা আছে। অনেক সময় মাসিক প্রাপ্য নিয়মিত মেলে না, মেলে না পালা-অনুষ্ঠানের সময় চারবেলা ঠিকমত আহারাদি। প্রতিদিন দুই বা তিনবার করেও পালা পরিবেশন করতে হয় (বিশেষত বড় মেলায়)। এই শ্রমের মূল্য মেলে না।

নদীয়ার পুতুলনাচের শিল্পীকর্মীদের অনেকেরই অন্য কোনও জীবিকা নেই, নেই আয়ের অন্য কোন সূত্র। বর্ষার চারমাস কেউ কেউ বেকার বাড়িতে বসে থাকেন। কিছু আছেন কৃষক ও ক্ষেতমজুর, তাঁরা চাষের কাজ করেন। কেউ কেউ আবার এই সময় জনমজুরও খাটেন। শিল্পীকর্মীদের গড়ে বার্ষিক আয় ২২৬৫ থেকে ৩৫০০ টাকার মধ্যে, তবে ৫০০ টাকার নিচে কারও বার্ষিক আয় নেই। এই তথ্য অনুযায়ী পুতুলনাচের শিল্পীকর্মীরা চরম অভাবগ্রস্ত ও খুবই গরিব।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করে তারের পুতুলনাচের দল গঠন করলেই সেই দলের আর্থিক সাফল্য হয় না। দলের আর্থিক সাফল্য নির্ভর করে দল পরিচালনার দক্ষতা-ক্ষমতার উপর, পালার জনপ্রিয়তার উপর এবং আরও কিছু পরিবেশিক-পারিপার্শ্বিক কারণের উপর।

নদীয়ার তারের পুতুলনাচের শিল্পীকর্মীরা প্রায় সকলেই সাক্ষর। প্রায় অধিকাংশ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ। উল্লেখ্য যে শিল্পীকর্মীদের স্ত্রীদের মধ্যে ৬০ শতাংশ সাক্ষর। শিল্পীকর্মীরা সকলেই পুরুষ। মহিলা পুতুলনাচলোকশিল্পী নদীয়ায় একজন আছেন, তাঁর নাম সুমিত্রা মিস্ত্রী। তিনি পুতুল নাচাতে পারেন, বলা যেতে পারে সুদক্ষা। হাঁসখালির অদূরে মুড়াগাছা কালোনীতে তাঁর বাড়ি। এখন তাঁর পরিবারের প্রায় সকলেই পুতুলনাচের সঙ্গে যুক্ত। সুমিত্রা এখন পরিবারের ছোটদের পুতুলনাচ শেখান। বিধবা সুমিত্রা পরিবারে সকলের বড়।

নদীয়ার পুতুলনাচের পুতুলনির্মাতাদের মধ্যে অমরকৃষ্ণ দাস (মুড়াগাছা কলোনী), শ্যামল মণ্ডল (রামদুলালপুর) ও জগবন্ধু সিং (বড়বেড়িয়া)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। অমরকৃষ্ণ দাস সুদক্ষ শিল্পী। তিনি পুতুলনাচাতেও পারেন।

পুতুল তৈরির সরঞ্জাম: রং, তুলি, সোলা, বাঁশ, কাঠ, আঠা, সুতো, বিভিন্ন ধরণের কাপড়, কাটার জন্য কাঁচি-ছুরি ইত্যাদি যন্ত্রপাতি, মাটি, তুলো, দড়ি, পেরেক, ছাঁচ, ফেবিকল আঠা, পুতুলের নকল গহনা, ভেলভেট, চুমকি জাতীয় ডাকের সাজ, তার ও পুতুলের জন্য পাটশনের চুল প্রভৃতি।

নদীয়ার সুতোয় টানা তারের পুতুলনাচের দলগুলি আজ নানা সমস্যার দীর্ণ। অনেকদল ঋণভারে জর্জরিত। আর্থিক ক্ষতির ফলে দলের অবলুপ্তি ঘটছে। সামগ্রিক ভাবে পুতুলনাচের দলগুলির সমস্যা বহুবিধ। থানা-মহকুমাশাসক পর্যায়ের পুতুলনাচ প্রদর্শনের অনুমতির জন্য লাইসেন্স পাওয়া নিয়ে অর্থদণ্ড ও অযথা হয়রানি। বারবার হাঁটাহাটি করতে হয়। এই দুই কর্তৃপক্ষ কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেদের মনে করেন যে তাঁরা পুতুলনাচের লোকশিল্পীদের যেন অনুগ্রহ করছেন—করুণা করছেন। স্বভাবতই তাঁরা তোয়াজ পছন্দ করেন, তাঁদের স্তাবকতা করতে হয়, তবে মেলে অনুমতি। কোন কোন ক্ষেত্রে নগদ অর্থ ঘুষও দিতে বাধ্য হতে হয়। একবার এক কর্তৃপক্ষের অধস্তন কর্মচারী তাঁর শিশুকন্যার জন্য এক পুতুলনাচের দলের কাছ থেকে একটি পুতুলই চেয়ে বসেন। প্রদর্শনের অনুমতি পাবার ব্যাপারে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুতুলনাচের দলের অভিজ্ঞতা মর্মান্তিক ও মর্যাদাহানিকর।

পুতুলনাচের দলকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা মহানগরে যাবার পথে চুঙ্গিকর দিতে হয়।

পুতুলনাচের দলকে সংস্থাগতভাবে বৃত্তিকর দিতে হয়। দলের লোকশিল্পীদেরও মধ্যেও কাউকে কাউকে বৃত্তিকর দিতে বাধ্য হতে হয়।

পুতুলনাচ প্রদর্শনের জন্য অনেকস্থানে প্রমোদকরও দিতে হয়।

পুতুলনাচের দলের প্রদর্শনকালে আলোর সমস্যা আছে। হ্যাজাক এখন অচল। জেনারেটর ব্যয়বহুল, তদুপরি, কেরোসিন তেল দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ। বিদ্যুৎ সংযোগ সব স্থানে থাকে না। থাকলেও সহজে পাওয়া যায় না। আবার পাওয়া গেলেও সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে পুতুলনাচ প্রদর্শনকালে বিদ্যুৎ-বেহাল হয়, জেনারেটর রাখার প্রয়োজনীয়তা থাকেই। অনুষ্ঠানস্থলে অস্থায়ী বিদ্যুৎ-সংযোগ পেলেও অর্থদণ্ড ও হয়রানির একশেষ হয়। হ্যাজাকের কেরোসিন তেল ন্যায্য মূল্যে মেলে না, বেশি দামে কিনতে হয়। পুতুলনাচের দলে বিদ্যুৎ-প্রযুক্তি জানা একজন লোক থাকলে ভাল হয়। না থাকলে স্থানীয় লোকের সাহায্য নিতে হয়। সুযোগ বুঝে সেও বেশি অর্থ দাবী করে, ফলে দলের বেশি অর্থ ব্যয় হয়।

পুতুলনাচের দলের বহুবিধ সরঞ্জামাদি (তাঁবু, চট, পুতুলের বিরাট টিনের বাক্সগুলি, কাঠ বা বাঁশের মঞ্চ, মাইক ইত্যাদি) নিয়ে যাতায়াতের পরিবহনজনিত সমস্যা আছে। দলের নিজস্ব ম্যাটাডোর জাতীয় ভ্যানগাড়ি থাকে না, থাকলে সুবিধা হয়।

অধুনা গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক হারে ভি. ডি. ও. প্রদর্শনীতে (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেআইনীভাবে) পুতুলনাচ মার খাচ্ছে। যে গ্রামে ভি. ডি. ও. চলে, সেখানে কিছুতেই পুতুলনাচের দলকে পুতুলনাচ প্রদর্শন করতে দেয়না। পাশের গ্রামে গিয়ে পুতুলনাচ দেখালে ভি. ডি. ও. হলের মালিক তখন ভি. ডি. ও.তে আকর্ষণীয় সিনেমার ক্যাসেট দেখান। ফলে পুতুলনাচ দেখতে দর্শক কম আসে? যদি পুতুলনাচের দল পৌরাণিক পালা প্রদর্শন করে, তখন আবার ভি. ডি. ও.-তে পৌরাণিক বিষয়ের সিনেমা দেখানো হয়। ভি. ডি. ও. হলে গিয়ে একটাকায় চেয়ারে বসে সিনেমা দেখা যায়। তাই পুতুলনাচের দলকেও

চেয়ারের আসনের ব্যবস্থা করতে হয় এবং পুতুলনাচে চেয়ার আসনে একটাকার বেশি মূল্যের টিকিট করা যায় না, অথচ প্রতিদিন চেয়ারের ভাড়াই একটাকা স্থানীয় ডেকরেটরকে দিতে হয়। অনেক গ্রামে আবার চেয়ার ভাড়া পাওয়া যায় না। আরও নানাভাবে ভি. ডি. ও. হলের দৌরাত্ম্যে পুতুলনাচের দল নাজেহাল নাকাল হয়। ভি.ডি.ও. হলের সঙ্গে সাধারণভাবে অনেক ক্ষেত্রে যুক্ত থাকে স্থানীয় মাস্তানেরা, তারা পুতুলনাচের দলকে অতিষ্ঠ ও উত্ত্যক্ত করে, টাকা চায়। প্রতিদিন টাকা না দিলে পুতুলনাচ দেখাতে দেয় না।

দূরদূরান্তরে পুতুলনাচ দেখানোর স্থানীয় উদ্যোক্তা মেলে মেলায় পূজায় উৎসবে বা সাধারণভাবে। স্থানীয় এইসব উদ্যোক্তারা পুতুলনাচের দলের আর্থিক ক্ষতি হলেও অনেক অর্থ দাবী করে এবং পুতুলনাচের দলকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সমুদয় অর্থই দিতে বাধ্য হতে হয়—দলের পুতুলনাচ প্রদর্শনে আর্থিক ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও। অনেক সময় প্রদর্শন স্থানের ব্যবহারের জন্য (অবশ্যই সাময়িক ভাবে পুতুলনাচ দেখানোর জন্য) স্থানীয় পূজা কমিটি বা ক্লাবকে মোটা টাকা চাঁদা দিতে হয়, স্থানীয় মাস্তানদের তোলার টাকা দিতে হয়। দাবী মতো টাকা না দিলে পুতুল-মাইক-চট-ত্রিপল-পলিথিন ইত্যাদি কেড়ে নেয়। স্থানীয় থানায় জানিয়ে কোনও লাভ হয় না—প্রতিকার হয় না, বরং ক্ষতিই হয় বেশি অথবা হয়রানি হতে হয়। আবার, বহির্বঙ্গে নিভৃত গ্রাম এলাকায় পুতুলনাচ সাতদিন ধরে দেখাবার শেষদিন গভীর রাতে একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত পুতুলনাচের দলের অস্থায়ী শিবিরে হানা দেয় এবং প্রাণের ভয় দেখিয়ে বলপূর্বক সমুদয় অর্থ নিয়ে যায়।

পুতুলনাচের অনুষ্ঠানের এখন চটের দর্শক-আসন অচল। আবার শীতকালে পলিথিনে বসতে অসুবিধা হয়। ত্রিপল দামী ও ভারী, সহজ বহনযোগ্য নয়। গ্রামাঞ্চলে দর্শক আসন চেয়ার সংগ্রহ বা ভাড়া পাওয়া যায় না, পেলেও ভাড়া লাগে বেশি।

পুতুলনাচের অনুষ্ঠানে দর্শক-আসনে চেয়ার রাখার সমস্যা হল: সাতদিনের অনুষ্ঠান শেষে দেখা যায় যে ভাড়া করা অনেকগুলি চেয়ার ভেঙে গেছে, তখন চেয়ার সারাবার জন্য অর্থ ব্যয় হয়। কোনও অনুষ্ঠানে গোলমাল হলে, সবার আগে দর্শক বা দুষ্কৃতীরা চেয়ার ভেঙে দেয়। অনেক জায়গায় হঠাৎ বিদ্যুৎ-বেহাল হলে অন্ধকারের সুযোগে চেয়ার চুরিও যায়।

পুতুলনাচের অনুষ্ঠান চলাকালীন আকস্মিক ঝড়বৃষ্টি হলে নানা সমস্যা সৃষ্টি করে। অসময়ের ঝড়বৃষ্টি পুতুলনাচের অন্তরায়। দর্শক সমাগম কম হয়। তাঁবু-শামিয়ানা-চাঁদোয়ার উপরের চট ও নিচে দর্শক আসনের চট ঝড়বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুতুলনাচের মঞ্চেরও ক্ষতি হয়।

পাটপ্রধান অঞ্চলে হালে অর্থকরী ফসল পাটচাষের সমস্যা দেখা দেওয়ায় সে সব অঞ্চলে পুতুলনাচ জমানো যাচ্ছে না। লোকের হাতে টাকাপয়সা না থাকলে পুতুলনাচ দেখতে আসবে কেন?

আগে গ্রামঞ্চলে পূজা অনুষ্ঠানে বিশেষ করে দুর্গাপূজা-কালীপূজায় পুতুলনাচ দেখানো

হত। এখন পূজায় প্যানডেল-আলোকসজ্জায় ও মাইকে বেশি ব্যয় হয়। উদ্যোক্তারা ভি. ডি. ও.-তে সিনেমা দেখান, পুতুলনাচ আর দেখাতে আগ্রহী হন না।

একসময় বৃহত্তর অসম রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে বিশেষত বাংলা ভাষাভাষী এলাকায় তারের পুতুলনাচের সমাদর ছিল। এখন উগ্রপন্থী কার্যকলাপ ও অস্থিরতাজনিত পরিস্থিতিতে রাতে পুতুলনাচ দেখতে দর্শক আসে না। অধুনা অসমের পুতুলনাচের দল তাঁদের এলাকায় ভিন্ রাজ্যের পুতুলনাচের দলকে পুতুলনাচ দেখাতে দেন না।

আলোকসম্পাতের আধুনিকতা প্রয়োগকৌশল নদীয়ার তারের পুতুলনাচের দলের শিল্পীদের অনেকেরই অজানা, তেমনি দৃশ্য ও মঞ্চ কৌশলও অজানা। চিরাচরিত প্রয়োগ কৌশল আজকের দিনে অচল। যেমন, 'হরিশ্চন্দ্র' পৌরাণিক পালায় বিদ্যুৎ-কৌশলে শ্মশানের, আগুনের ও টেবিলফ্যানের সাহায্যে ঝড়বৃষ্টি রাতের দৃশ্যের আবহ সৃষ্টি করা যায় পুতুলনাচের পালায়। এইসব দৃশ্য দর্শকনন্দিত হয়, লোক মুখে প্রচারিত হয়, ফলে দর্শকসমাগম ক্রমেই বাড়তে থাকে। প্রয়োগকৌশল না জানায় অনেকদলই এই সব দৃশ্য দেখাতে পারেন না।

তারের পুতুলনাচে সাবেকি সাজসরঞ্জামে দর্শকমন জয় করা যায় না। মঞ্চে পিছনে শুধু পর্দায় পুতুলনাচের অনুষ্ঠান জমে না। আকর্ষণীয় মঞ্চ বিন্যস্ত হলে দর্শকেরা আকৃষ্ট হয়। এই ধরণের মঞ্চ বিন্যাস করার জ্ঞান অনেকেরই নেই। অথচ জানা থাকলে সহজেই করা যায়।

বহির্বঙ্গে পুতুলনাচের অনুষ্ঠানে আঞ্চলিকতা-প্রাদেশিকতা জনিত সমস্যা আছে। এ ছাড়া, বহির্বঙ্গে পুলিশের ভূমিকায় নদীয়ার তারের পুতুলনাচের দলকে অতিষ্ঠ হতে হয়। অধুনা রাজনীতি সর্বগ্রাসী, পুতুলনাচের অনুষ্ঠানের স্থানীয় উদ্যোক্তরা কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত হলে, বিপক্ষ দল বিঘ্ন ঘটাবার চেষ্টা করে অনুষ্ঠানে।

নদীয়ার তারের পুতুলনাচের দলে অনেকেরই টেপরেকর্ডার নেই। অথচ টেপরেকর্ডারে আবহসঙ্গীত অন্যান্য নাট্যঅনুষঙ্গের যথোপযুক্ত ব্যবহার করা যায়। অনেকে টেপরেকর্ডারের প্রয়োগকৌশল জানেনও না। ফলে বস্তুনিষ্ঠ দৃশ্য বিন্যস্ত হয় না। টেপরেকর্ডারের যথোপযুক্ত প্রয়োগে পুতুলনাচ নিঃসন্দেহে উন্নত হতে পারে এবং আকর্ষণীয় প্রযোজনা হতে পারে।

তারের পুতুলনাচে সাম্প্রতিক জনপ্রিয় ও সফল (অবশ্যই বাণিজ্যিক ভাবে) সুপারহিট যাত্রাসিনেমার কাহিনী নির্বাচন করা হয় কিন্তু প্রয়োগজনিত সমস্যা দেখা যায়। আবার, সুপরিচিত সিনেমাস্টারদের আদলে পুতুলের মুখ দর্শকেরা দেখতে চায়। কিন্তু পুতুলনাচের দলে শুধুমাত্র একটি পালা থাকে না। পুতুল থাকে সীমিত। স্বল্পসংখ্যক পুতুলেই নানা পালা পরিবেশিত হয়। অনেক সময় একই পুতুলকে পোশাক পরিবর্তন করে (একটি পোশাকের উপর আরেকটি পোশাক চাপিয়ে) অন্য পালায় নামানো হয়। তখন এই মুখমণ্ডল অর্থাৎ সুপরিচিত সিনেমাস্টারের মুখ থাকলে অসুবিধা হয়।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে পুতুলনাচের দলগঠনে ও পরিচালনায় ব্যয়ভার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে,

অর্থসংস্থানের কোন সুযোগ নেই। অধিকাংশ দলই আর্থিক সংকটাপন্ন। জেলার বাইরে দূরে পুতুলনাচ চলার সময় অর্থাভাব দেখা দিলে একমাত্র সোনা বন্ধক রাখলে ধার মেলে, তাও চড়া সুদে। ব্যক্তি ঋণ দেন, ফলে তিনি বাড়তি কিছু সুযোগ সুবিধাও নিয়ে থাকেন। দলের লোকশিল্পীরা আর্থিকপীড়িত, তাঁরা সোনা সঙ্গে নিয়েও দলের সঙ্গে বাইরে যান না। যদি সদ্যবিবাহিত কারও হাতের আঙুলে বিয়ের আংটি থাকে, তাহলে তাকে সেই আংটি বন্ধক দিতে হয় দলের আর্থিক সংকটকালে। বলা বাহুল্য, এই আংটি আর তার হাতের আঙুলে ফিরে আসে না। এই দুঃসহ বেদনার স্মৃতি বাকি জীবন নীরবে বহন করতে হয়।

শারদীয়া দুর্গোৎসবের মহালয়ার পূর্বেই পুতুলনাচের দলগুলি পুতুলনাচ দেখানোর জন্য বাইরে বের হয়। মাসাধিক কাল পূর্ব থেকেই চলে দলের প্রস্তুতি। পুতুলের পালার চরিত্রানুযায়ী নতুন সাজপোশাক পরাতে হয়। পুরানো পুতুলের মুখ-হাতে রঙ দিতে হয়। প্রয়োজনে নতুন পুতুল করতে হয়, অসুন্দর পুতুলকে সুন্দর করতে হয়। পুতুলনাচের দলের মালিক আর্থিক পীড়িত, তাঁর কোন সঞ্চিত অর্থ নেই। তবু, ধারকর্জ করে পুতুলের সাজপোশাক নতুন করতে হয়। তাঁকে তখন ভুলে যেতে হয়—পরিবারের সকলের কথা এমন কি শিশুদের কথাও। পূজার পূর্বে বা পূজার সময়ে পরিবারের কেউ নতুন জামাকাপড় শাড়ি পায় না অথচ পুতুলের নতুন জামাকাপড়ের সাজপোশাক পরাতেই হয়। নিদারুণ বেদনাদায়ক পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয় পুতুলনাচের দলের মালিককে।

দারিদ্র্য-প্রপীড়িত পুতুলনাচের শিল্পীকর্মীদের বছরের কমবেশি আটমাস পরিবার পরিজন থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেক দূরে থাকতে হয় পুতুলনাচ দেখানোর জন্য। কোন নির্দিষ্ট স্থানে তাঁরা আটমাস থাকেন, নানা স্থানে তাঁরা পুতুলনাচ দেখান। এই আটমাস পরিবারের সকলের কাছে তাঁদের ঠিকানা যেন হারিয়ে যায়। হয়তো, তাঁরা পরিবারে চিঠিপত্র লেখেন, কিন্তু পরিবারের কেউ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন না, চিঠিপত্রাদি দিতে পারেন না। কারণ, কোন একটি স্থানে পুতুলনাচের দল সাত থেকে দশদিনের বেশি থাকেন না। সে কারণে ঠিকানাও জানাতে পারেন না। সাম্প্রতিক অবনমিত মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে পারিবারিক নানা সংকট দেখা দেয় অনেক ক্ষেত্রে। দীর্ঘদিন পরিবারে অনুপস্থিতিহেতু নানা সমস্যায় অনেকের পরিবারের জীবন বিধ্বস্ত হয়। আবার, পরিবারগত-প্রাণ অনেক শিল্পীকর্মী বেদনাদীর্ণ হৃদয়ে প্রতি রাতে পুতুলনাচের পালার পর সাময়িক আস্তানায় শুয়ে শুয়ে মনে করেন পরিবারের কথা, চোখের সামনে ভেসে ওঠে দারিদ্র্য লাঞ্ছিত পিতামাতার করুণ মুখ, পতিপ্রাণা প্রোষিতভর্তৃকার মলিন মুখ আর প্রিয় শিশুসন্তানের মুখ, তখন তাঁরা তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হন।

একটি নতুন স্বয়ং সম্পূর্ণ তারের পুতুলনাচের দল গড়তে এখন বিনিয়োগ করতে হয় লক্ষাধিক টাকা। বিনিয়োগে লাভক্ষতির ঝুঁকি আছে। কোনও ঝুঁকি না নিয়ে সরকারী স্বল্প সঞ্চয়ে বিনিয়োগ করলে পাঁচ বছর পর মিলবে দ্বিগুণ পরিমিত অর্থ। পুতুলনাচে বিনিয়োগ

করলে আসল টাকাই উঠে আসবে কি না সন্দেহ আছে। তাই পুতুলনাচে অর্থবিনিয়োগকারীর অভাব দেখা দিয়েছে। পুরানো দলগুলি অর্থাভাবে উন্নত করতেও পারছে না, সেখানেও মূলধনের একান্ত অভাব, ফলে বহু পুতুলনাচের দলের অবলুপ্তি ঘটছে।

নদীয়ার সুতোয় টানা তারের পুতুলনাচের যাবতীয় সমস্যার সম্পূর্ণ দূরীকরণ ও সমাধান সুদূরপরাহত। তবু বহু সমস্যার আশু সমাধান সম্ভব। পুতুলনাচ প্রদর্শনে লাইসেন্স প্রথার সরলীকরণ করতে হবে বা রদ করতে হব। সরকারী অনুদানে বা সুলভমূল্যে বা দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে জেনারেটর ক্রয়ের সুযোগ দিতে হবে পুতুলনাচের দলকে। দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে পরিবহনের জন্য ম্যাটাডোর জাতীয় মোটরগাড়ি (ডিজেল চালিত হলে সুবিধা হয়) ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এই দুই ব্যাপারে সরকার পুতুলনাচের দলকে ভর্তুকি দিতে পারেন। ভি.ডি.ও. প্রদর্শন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বাণিজ্যিক ও স্থায়ী ভি. ডি. ও প্রদর্শনে কঠোর বিধিনিষেধ প্রবর্তন করতে হবে। অপসংস্কৃতিকূলক ভি. ডি. ও প্রদর্শনে কঠোর সাজা দিতে হবে। পুতুলনাচের দলের উপর ভি.ডি.ও.-দৌরাত্ম্য সরকারী উদ্যোগে বন্ধ করতে হবে। পুতুলনাচ অনুষ্ঠানে স্থানীয় পুরসভা, পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রামপঞ্চায়েতের সহযোগিতা ও প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ প্রয়োজন—যাতে পুতুলনাচের অনুষ্ঠান পরিবেশনে কোনও অসুবিধা না হয়। পুতুলনাচ দেখানোর জন্য থানা থেকে অনুমতি সহজে দিতে হবে, থানার কাছ থেকে পুতুলনাচের দলগুলি যেন হয়রান না হয়—সেজন্য থানাগুলিকে নির্দেশ জারী করতে হবে। পুতুলনাচের দলগুলিকে তাঁবু বা ছাউনীর জন্য সুলভ মূল্যে বা দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে ত্রিপল বা মজবুত পলিথিন ক্রয়ের সুযোগ দিতে হবে। পুতুলনাচের শিল্পীকর্মীদের বারান্তরে পর্যায়ক্রমিক আলোকসম্পাত, মঞ্চদৃশ্যসজ্জার আধুনিক প্রয়োগকৌশল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। পুতুলনাচ দলের অধ্যুষিত এলাকায় পর্যায়ক্রমিক একাধিক প্রশিক্ষণ শিবির ও কর্মশালার আয়োজন করতে হবে। মোটামুটি বছরের যে চার মাস পুতুলনাচের শিল্পীকর্মীরা পুতুলনাচ বর্ষার জন্য দেখাতে পারেন না—বাড়িতে থাকেন, তখন প্রশিক্ষণ শিবির তথা কর্মশালার আয়োজন হলে শিল্পীকর্মীরা যোগদান করতে পাবেন, তবে অবশ্যই তাঁদের প্রশিক্ষণশিবিরে প্রতি কর্মদিনের জন্য উপযুক্ত দিনভাতা, আহার, বাসস্থান ও যাতায়াতের ব্যয় বাবদ অর্থ দিতে হবে।

নদীয়ার তারের পুতুলনাচের দলগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র পুতুলনাচ দেখানোর অনুষ্ঠানের বৈধপত্র রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দিতে হবে। রাজ্য সরকারকেই উদ্যোগ গ্রহণ করে ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগাদি করে ভারতের নানা স্থানে অনুষ্ঠান করার অর্থাৎ পুতুলনাচ দেখানোর বৈধপত্র পুতুল নাচের দলগুলিকে দিতে হবে।

যেহেতু পুতুলনাচ প্রচার ও জনসংযোগের উপযুক্ত মাধ্যম, সেহেতু রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে পুতুলনাচের প্রচার ও জনসংযোগের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে হবে। পুতুলনাচের দলকে সরকারী অনুদান দিয়ে পরিবার কল্যাণ, সাক্ষরতা প্রসারণ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ইত্যাদি বিষয়ে উদ্দেশ্যমূলক পুতুলনাচের পালার অনুষ্ঠান করতে হবে। উদাহরণত,

পশ্চিমবঙ্গ পুতুলনাট্য সংঘ প্রযোজিত 'লালন ফকির' তারের পুতুলনাচ পালা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উল্লেখ্য যে উত্তর প্রদেশের লখনউ শহরে অবস্থিত গান্ধীজী-রবীন্দ্রনাথের শিষ্যা তথা ভারতে নিরক্ষরতাদূরীকরণে উৎসর্গীকৃতাপ্রাণা ড. ওয়েলদি ফিসার (১৮৭৯-১৯৮০) প্রতিষ্ঠিত 'সাক্ষরতা নিকেতন' (Literacy House) প্রযোজিত পরিবার কল্যাণ বিষয়ক পুতুলনাচপালা (বেণীপুতুলনাচ শৈল্পীর) অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কি পুতুলনাচকে অনুরূপভাবে কাজে লাগাতে পারেন না?

নদীয়ার তারেব পুতুলনাচের দলকে সরকারী উদ্যোগে গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য অর্থবিনিয়োগকারী সংস্থার দীর্ঘমেয়াদী পরিশোধ্য ঋণপ্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এই ঋণপ্রদানে সরকারকে ভুর্তুকীও দিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার রেডিও ও টি.ভি. উৎপাদন করেন। রাজ্য সরকারকে টেপরেকর্ডারও উৎপাদন করতে হবে এবং পুতুলনাচের দলকে সুলভে কিস্তিতে ভাল টেপরেকর্ডার ক্রয়ের সুযোগ দিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে দুঃস্থ পুতুলনাচের লোকশিল্পীদের সরকারী আর্থিক অনুদান (বাৎসরিক) বা মাসিক লোকশিল্পীভাতা প্রদান করতে হবে। বছরের শ্রেষ্ঠ জনসমাদৃত পুতুলনাচের পালার দলকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করতে হবে।

পুতুলনাচের শিল্পীকর্মীদের নিয়ে সমবায় সমিতি গঠনে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে।

নদীয়ার সুতোয় টানা পুতুলনাচ পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় প্রসারিত হচ্ছে। বাঁকুড়া জেলার রামপুর গ্রামের স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অঞ্চলে নদীয়ার সুতোয় টানা পুতুলনাচের দলের পুতুলনাচ দেখে আকৃষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েই নিজে সুতোয় টানা পুতুলনাচের দল গঠন করেন, তাঁর দলের নাম 'স্বপনপুরী পুতুল নাট্য সমাজ।' নদীয়ারই একটি পুতুলনাচের দলের পুতুল ও উপকরণ-সরঞ্জামাদি তিনি ক্রয় করেই পুতুলনাচের দলের পত্তন করেন। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলায় পুতুলনাচেব দল গঠিত হতে পারে, পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য না থাকলেও পুতুলনাচের শিল্পী হওয়া যায়—স্বপনকুমারই তার প্রমাণ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকাররের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ নদীয়া জেলার পুতুলনাচের লোকশিল্পীদের ১৯৯০-৯১ আর্থিক বছর থেকে গোষ্ঠীবীমা প্রকল্প চালু করেছেন। প্রকল্পভুক্ত কোন পুতুলনাচের লোকশিল্পী প্রয়াত হলে তাঁর মনোনীত পরিজন এককালীন পাঁচ হাজার টাকা পাবেন। অন্যথায় ৬০ বৎসর মেয়াদ উত্তীর্ণের পর সসুদ জমা অর্থ লোকশিল্পী নিজে পাবেন। এই বীমার কিস্তির অর্থ সরকার জমা দিচ্ছেন। নদীয়া জেলায় মোট ১৫ জন পুতুলনাচের লোকশিল্পী গোষ্ঠীবীমা প্রকল্পভুক্ত হয়েছেন, তাঁরা হলেন: গোপাল অধিকারী, বিকাশচন্দ্র রায়, রামকান্ত ঠাকুর, মৃত্যুঞ্জয় বৈরাগী, দীনুলাল বৈরাগী, মোহনলাল বৈরাগী, শ্যামলকুমার মণ্ডল, জগদীশ বিশ্বাস, রঞ্জন রায়, অরবিন্দ মজুমদার, অমরকৃষ্ণ দাস, শঙ্কর মৃধা, সত্যরঞ্জন হালদার, বিধান মজুমদার ও অমূল্য রায়।

নদীয়া জেলার হাঁসখালি থানার মুড়াগাছা কলোনীর পুতুলনির্মাতাশিল্পী অমরকৃষ্ণ দাসের ১৪ বৎসর বয়স্কা কন্যা রিঙ্কু দাস ভারতসরকারের C.C.R.T. সংস্থার কাছ থেকে পুতুলনাচ চর্চার জন্য মাসিক একশত টাকা বৃত্তি পেয়েছেন। রিঙ্কু অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে। রিঙ্কু এখন কলকাতায় সমসাময়িক পুতুলনাচের খ্যাতনামা শিল্পী সুরেশ দত্তের অধীনে প্রশিক্ষণরতা। রিঙ্কু পুতুল নির্মাণ সহ পুতুল সঞ্চালনাদি পুতুলনাচের নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করছে। ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার নদীয়ার পুতুলনাচের শিল্পীপরিবারের সম্ভাবনাময় কিশোর কিশোরীদের অনুরূপ বৃত্তি দিলে নদীয়ার পুতুলনাচ সমৃদ্ধ উন্নত হবে বলে আশা করা যায়।

প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য যে পুতুলনাচে নিবেদিতপ্রাণ সুরেশ দত্ত 'ক্যালকাটা পাপেট থিয়েটার'-এর মাধ্যমে সনাতনী পুতুলনাচের লোকশিল্পীদের সমীক্ষা করেছিলেন, সেই সমীক্ষায় দেখা যায় যে বর্তমানে বয়স্ক সনাতনী গ্রামীণ পুতুলনাচের শিল্পীকর্মীরা তাঁদের নিজেদের পরিবারের সন্তানদের এই শিল্পীকর্মে শিক্ষা দিতে বা যুক্ত করতে একান্তই অনাগ্রহী, কারণ তাঁদের ভয় যে সন্তানেরা এই বৃত্তি গ্রহণ করে জীবিকা অর্জন করতে পারবে না, ফলে সম্ভাবনাপূর্ণ ঐতিহ্যমণ্ডিত সনাতনী পুতুলনাচ তথা গৌরবময় লোকশিল্প লোকনাট্য মাধ্যম পুতুলনাচ আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে বা পুতুলনাচের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

কিন্তু এই অন্ধকার যে শেষ কথা নয়, সে সম্পর্কে জানা যায় সমসাময়িক পুতুলনাচের বা নন্-ট্র্যাডিশনাল পুতুলনাচের অপর খ্যাতনামা শিল্পী তথা পিপলস্ পাপেট থিয়েটার-এর রূপকার হীরেন ভট্টাচার্য লিখিত 'পুতুল নাটক' রচনায় (গণশক্তি, রবিবারের পাতা, ১৪ আগষ্ট ১৯৯৪)। তাঁর এই মনোজ্ঞ তথ্যসমৃদ্ধ রচনায় আছে : '.......এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বাজিকরেরা প্রধানত গ্রামীণ ভূমিহীন বা নামমাত্র ভূমির অধিকারী গরিব কৃষক।.....সেকালে.....দক্ষতার এবং জনপ্রিয়তার বান ডেকেছিল। কিন্তু আজ সে বানের জল নেমে গেছে শুধু নানা খানা খন্দে যে বানের কিছু কিছু জল এখন জমে আছে।.....প্রধানত নদীয়া জেলায় এখানো প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাচিয়ে কৃষকদের সন্ধান পাওয়া যায়। চাষের মরসুমে এঁরা বাড়িতে থেকে চাষবাস করেন। চাষের মরসুম চলে গেলে বেকারত্বের অবকাশে গ্রামীণ মেলা ইত্যাদিতে আজো এরা পুতুলনাচ দেখিয়ে যৎসামান্য রোজগার করার চেষ্টা করেন। এঁদের রক্ষা করার পথে আজ প্রধান অন্তরায় দারিদ্র্য। তার উপরে এঁদের পুরাতন ধরণের পুতুলনাচকে আজ সিনেমা টি. ভি.. ইত্যাদির মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় হেরে দুহাত মাথার উপর তুলে দরিদ্রতর অন্ধকার অবস্থার মধ্যে পশ্চাদপসরণ করতে হচ্ছে।.... আজ কঠিনতর জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত। অন্নচিন্তা চমৎকার কতরে কবিতা কুতঃ ? এঁদের অবস্থার অবনমনের আরো একটি দিক আছে, সেটি হচ্ছে শিল্পগত দিক। অতীতে একদিন লোককলার অন্তর্গত এই ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাচ খুবই জনপ্রিয় ছিল। কারণ অতীতে সেই যুগের সঙ্গে এই শিল্প তাল মিলিয়ে চলতে পেরেছিল। কিন্তু আজ যুগের অগ্রগতির সঙ্গে তার পদক্ষেপ মিলছে

না, তাই সে অবক্ষয়গ্রস্ত। ঐতিহ্যগত ভাবে এতদিন গ্রামীণ পুতুলনাচের বিষয়বস্তু ছিল প্রধানত রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনী। কখনো কখনো 'রূপবান কন্যার কাহিনী' ইত্যাদি পুরাতন লোককথা। আজ দেশের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার বহুল পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আজ যখন আধুনিক সাহিত্যে, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত ও নাটক নতুন নতুন বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছে, যখন প্রগতিমুখী সঙ্গীত ও নাট্য আন্দোলন গড়ে উঠেছে— যখন নাটকে, সঙ্গীতে, চিত্রে আধুনিক জনগণের জীবনযন্ত্রণা ও জীবনযুদ্ধের প্রতিফলন ঘটেছে তখন এই ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাচের একটা বড় অংশই পড়ে আছে সেই পৌরাণিকতার জগতে, সীতা, সাবিত্রী-নলদময়ন্তী ইত্যাদি নিয়ে। পৌরাণিক কাহিনীর প্রচ্ছদেও আধুনিক সমস্যার উপর আলোকপাত করা যায় (যথা মন্মথ রায়ের কারাগার নাটক কিংবা গণনাট্যের চাঁদ সওদাগর নাটক ইত্যাদি), কিন্তু ঐতিহ্যবাহী পুতুল নাচিয়েরা তাও করেন নি। আর একটা অংশ 'নটীবিনোদিনী' ইত্যাদি মনুষ্যাভিনীত নাটক-যাত্রার পালা কিংবা হিন্দি সিনেমার কাহিনী হুবহু পুতুলের সাহায্যে অভিনয় করার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এতে পুতুলনাটক হিসাবে তার স্বধর্মচ্যুতি ঘটেছে। পুতুলনাচের পুতুল মানুষ নয়। মানুষের হুবহু নকলও নয়। তবে তা কী? এ প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বের আধুনিক পুতুল নাটকের জনক সাবেক সোভিয়েতের সারগেই ও ব্রাৎসভ বলেছেন—In it is only an imitation, an imitation of a living being, then it is not a puppet, but a moving display figure in a Wax Museum. .... a puppet is allegorical in essence. তাছাড়া, পুতুলকে মানুষের অভিনয় করবার সবচেয়ে বড় বিপদ হলো এই যে পুতুল কখনো অবিকল মানুষের মতো অভিনয় করতে পারে না, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অভিনয় করার সময় জীবন্ত মানুষ মুহুর্মুহু মুখ ভঙ্গির পরিবর্তন করতে পারে এবং করে, সেই ক্ষেত্রে কাঠের বা কাগজের তৈরি স্থির পুতুলের মুখে কোন বিশেষ ভঙ্গি একবার খোদাই করে দিলে তার পুতুলজীবনে এর আর কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে না। এই রকম পুতুলের বহু সীমাবদ্ধতা রয়েছে যার জন্যে সে কিছুতেই মানুষের অভিনয়ের বিকল্প হতে পারে না। পুতুলের অভিনয় রীতি ভিত্তিগতভাবেই স্বতন্ত্র। তার সাফল্য মাপার মানদণ্ডও স্বতন্ত্র। সেই কারণেই নটীবিনোদিনী কিংবা সিনেমার নকল পুতুল নাটককে স্বধর্মচ্যুত করে এবং তার জনপ্রিয়তা নষ্ট করে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও ঐতিহ্যবাহী এই গ্রামীণ পুতুলনাচিয়েদের...পুতুলনাচাবার যে আশ্চর্য দক্ষতা ছিল, সেই দক্ষতার জোরেও ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাচ আরো কিছুদিন অনায়াসে টিকতে পারতো, কিন্তু যে পথেও একটি অর্থনৈতিক কারণ কাঁটা হয়ে দাঁড়াল। ....এটা অন্ধকারের দিকের কথা। কিন্তু শেষ কথা নয়। জগৎ প্রকৃতি জঙ্গম আর সেই জঙ্গমত্বের নিয়মেই দিনের পর যেমন রাত আসে তেমনই রাতের পরেও দিন আসে।' আশাবাদী হীরেন ভট্টাচার্য তাঁর উল্লিখিত রচনার শেষে আশা প্রকাশ করেছেন: '...আগামীদিনে ...পুতুলনাচের নতুন সম্ভাবনা দেখা দিতে শুরু করেছে পূর্বোক্ত অবক্ষয়গ্রস্ত গ্রামীণ ট্র্যাডিশনাল পুতুলনাচের কোনো দলের

মধ্যে। পশ্চিমবাংলায় সাক্ষরতা আন্দোলন, মাদকবিরোধী আন্দোলন, পণপ্রথা বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি গ্রামাঞ্চলে খুবই ব্যাপ্তি লাভ করেছে। ইদানীং দেখা যাচ্ছে গ্রামাঞ্চলে বেশ কিছু তরুণ পুতুল নাচিয়ে ট্র্যাডিশনাল ফর্মের মাধ্যমেই এই আন্দোলনগুলির পুতুল নাট্যরূপদানে আগ্রহী হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা দেখতে পাই এই জন্যে যে এঁরা জনজীবনে বাস্তবতার সঙ্গে শিল্পের গাঁটছড়া বাঁধার ব্যাপারে আগ্রহী। শুধু শিল্পের জন্যেই শিল্প নয়, জনগণের জন্যেই শিল্প—এই সাদা কথাটা তারা বুঝেছেন।'

পশ্চিমবঙ্গে নন-ট্র্যাডিশনাল আধুনিক সমসাময়িক পুতুলনাচের পথিকৃৎ রঘুনাথ গোস্বামীর মতে: '...ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে এতগুলো ঘরানা দেখতে পেয়েছি, নানা ধরণের পুতুলনাচ। ...রাজস্থানে কাঠপুতুলী আছে। ওড়িষ্যাতেও ঐ রকমই এক পুতুল আছে, সেগুলো রাজস্থানী পুতুলগুলোর চাইতে আর একটু বাল্কয়। সেটাও সূতোটানা পুতুল। ....কিছুদিন আগে আমরা জানতে পেরেছি যে বগুলাতে প্রায় ৫০ টি পরিবার পুতুলনাচ করেই খায়। অর্থাৎ তাদের ফসলের কাজকর্ম শেষ হয়ে যাবার পর তারা পুতুল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। শহরে শহরে ঘুরে বেড়ায়। এমন কি তাদের অনেকে নৈনীতাল পর্যন্ত যায়। ...কিন্তু এই সবকিছু দেখাটেখার পর আমার মনে হয়েছে, এই ঘরানাগুলো থেকে শিখবার মতো অনেককিছু আছে। তাদের দক্ষতা, সামান্য কতগুলো জিনিস দিয়ে একটা নাটক গড়ে তোলবার দক্ষতা, পুতুলগুলোকে জীবন্ত করে তুলবার দক্ষতা অসামান্য। কিন্তু একটা জায়গায় এসে তারা থেমে গিয়েছে। যদি আমরা মেনে নিই যে সংস্কৃতি বা কালচার একটা জঙ্গম প্রক্রিয়া, একটি অন গোয়িং প্রসেস, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই এগিয়ে চলবে। নাটক যেমন ভরতমুনির সময়েই থেমে নেই, এগিয়ে চলেছে, তেমনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার পুতুলনাচের ঘরানার থেকে শিখবার নানা উপাদান আছে, তাদের এগিয়ে নিয়ে যাবার মতো সম্ভাবনাময়। অসাধারণ একটি আর্টফর্ম। কিন্তু কোনো একটা জায়গায় এটা থেমে গিয়েছে।' (প্রতিক্ষণ। ৪ বর্ষ, ৪ সংখ্যা। ১৭ আগস্ট ১৯৮৬: রঘুনাথ গোস্বামীর সঙ্গে পূর্ণেন্দু পত্রীর সাক্ষাৎকার)।

হীরেন ভট্টাচার্য তাঁর রচনায় বিশ্বখ্যাত পুতুলনাচ-রূপকার সারগেই ও ব্রাৎসভ-এর কথা সশ্রদ্ধচিত্তে উল্লেখ করেছেন (গণশক্তি। ১৪ আগস্ট ১৯৯৪): '...ট্রাডিশনাল পুতুল সকল দেশেই ছিল এবং আছে আর সব দেশেই ট্রাডিশনাল পুতুলনাচের প্রথাবদ্ধতাও দেখা ছিল। ইউরোপের এই প্রথাবদ্ধতার অচলায়তন ভেঙে আধুনিক ঘরানার পাপেট থিয়েটার সৃষ্টির প্রাণপুরুষ হলেন সাবেক সোভিয়েতের মস্কো স্টেট পাপেট থিয়েটারের ডিরেক্টর সারগেই ও ব্রাৎসভ। সারা বিশ্বে আধুনিক পাপেটের জনক বলেই তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন। তিনি চীন, ভারত ইত্যাদি দেশের ট্রাডিশনাল পাপেট দেখেন এবং পুরাতন ফর্মের গুণগুলির সঙ্গে নতুন ফর্মের সমন্বয় সাধন করেন। পাপেট থিয়েটারের বিষয়বস্তুতেও তিনি ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেন। উল্লেখযোগ্য যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে হিটলারের নাৎসিবাহিনী

সোভিয়েত আক্রমণ করলে সারগেই ও ব্রাৎসভ তাঁর পাপেট ট্রুপ নিয়ে রণাঙ্গনে সৈনিকদের পাশে চলে যান। এই সময়ে তিনি যে পুতুলনাটক দেখান সেগুলির বিষয়বস্তু ছিল ফ্যাসিবাদবিরোধী। পুতুলনাটকের বিষয়বস্তুতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন। অন্যদিকে পুতুলনাটকের টেকনিকেরও তিনি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করেন।'

এই প্রসঙ্গেই রঘুনাথ গোস্বামী বলেছেন (প্রতিক্ষণ। ১৭ আগষ্ট ১৯৮৬): 'মস্কো পাপেট থিয়েটারের ডিরেক্টার সারগেই ও ব্রাৎসভকে বলা হয়, নব্য পুতুলনাচ ঘরানা তৈরির প্রধান প্রাণপুরুষ। তিনি যখন চীনে যান, সেখানে দেখেন চীনের সনাতন পাপেট থিয়েটারের শক্তি অসম্ভব, কিন্তু প্রায় তা অবলুপ্তির পথে। তখন তিনি তা বাঁচিয়ে তোলার জন্য অনেক আশ্চর্য কাণ্ড করেন। তিনি বুঝতে পারেন কবি, শিল্পী, ভাস্করেরা এই আর্টফর্মটার জন্য কিছু করে না, বা ভাবে না। এমনই অবহেলা। তাই, তাদের ডেকে নিয়ে তিনি বললেন, এই পুরনো ফর্মের সঙ্গে নতুনের একটা আদান প্রদান হওয়া সম্ভব কি না। সেই আদানপ্রদানের ফলে চীনদেশের সনাতন পুতুলনাটক কিন্তু নতুন প্রাণ পেয়েছে। আমাদের দেশে এমন ঘটেনি। কিন্তু বিভিন্ন ঘরানা দেখে আমার ধারণা, আমাদের শিখবার অনেক কিছু আছে। অনুকরণের কথা বলছি না আমি। অনুকরণ কোনো কাজ নয়। এর থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে, ভাবনা নিয়ে নতুন কিছু আমাদের করতে হবে। নতুন ট্রাডিশন তৈরি করতে হবে।' তাই আমরা মনে করি, সরগেই ও ব্রাৎসভ-এর প্রচেষ্টা থেকে নদীয়ার পুতুলনাচকে শিক্ষা নিতে হবে, চীন দেশের পুতুলনাচের সফল রূপান্তর থেকে নদীয়ার পুতলনাচের শিল্পীদের প্রাণিত হতে হবে। আর গতানুগতিক পথে চলা নয়। ড. সনৎকুমার মিত্র তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের পুতুলনাচ' গ্রন্থে এ কারণেই লিখেছেন: '....অনুকরণে কেউ বাঁচতে বা বড় হতে পারে না। কিন্তু আদান-প্রদান, সংমিশ্রণ-এর দ্বারা তো বাঁচা ও বাঁচানো যায়।'

'পূর্বভারতে আধুনিক পাপেট থিয়েটারের ভগীরথ' রঘুনাথ গোস্বামীর প্রচেষ্টায় নন-ট্র্যাডিশনাল পুতুলনাচের দলগুলির ঐক্যবদ্ধ সংগঠন ১৯৮২ সালে 'ফেডারেশন অব পাপেট থিয়েটার, ওয়েস্ট বেঙ্গল' গঠিত হয়। এই সংগঠন পুতুলনাচের কর্মশালা অনেকগুলি করে এবং নভেম্বর ১৯৮২ কলিকাতায় 'অবনমহল' মঞ্চে পুতুল নাট্যোৎসবও করে। এই উৎসবে নদীয়ার পুতুলনাচের ঐতিহ্যবাহী সনাতনী দল সহ অন্যান্য গ্রামীণ পুতুলনাচের দল পুতুলনাচ প্রদর্শন করে। হীরেন ভট্টাচার্য আক্ষেপ করেছেন (গণশক্তি। ১৪ আগস্ট ১৯৯৪): 'আজ ফেডারেশন ভেঙে গেছে এবং সেই পুতুলনাট্য দলগুলিও অনেকে কিছু হীনবল হয়ে পড়েছেন।' বাল্মীকি চট্টোপাধ্যায় আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ 'পত্রিকা' ৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: 'সাবেকি পুতুলনাটকের আর দিন নেই, প্রাচীনতম পুতুলনাটক আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে। ....পুতুলেরা তাদের কৌলীন্য হারিয়েছে।' তিনিও 'কৃষ্ণনগরে প্রচলিত ছিল পুতুলনাচ' লিখেছেন এই রচনায়। না, কৃষ্ণনগরে নয়, নদীয়া জেলায় প্রচলিত ছিল এবং আছে সনাতনী পুতুলনাচ।

সনাতনী পুতুলনাচ সম্পর্কে শ্রীসুরেশ দত্তের প্রতিবেদনের অংশ :

The puppet troupes are usually found to be scattered over the villages remot from township. Some times journey to reach their home is very painstakin, require all the roads, transportation, and weather to be in favourable conditions—which happen only in winter. But in that season the puppet troupes are away from home showing their art and earning whatever they can at the numerous village fairs. The best time to catch them at home is in the monsoon, as because they are engaged in cultivation and remain at home. Most of the puppeteers are farmers and having little or no land. Puppeteers have to fight with modern entertainment e.g. the cinema, record music, circus, T.V. and they stand defeated in the face of such irreristible attractions that such industrial or commercial entertainments hold out the villagers. Hence the puppet troupes are slowly facing extinction. Many of these puppeteers to supplement their income with other forms of occupation e.g. agriculture, weaving, fishing. The puppeteers are not willing to teach their art to their children for fear that they would not be able to make a living out of it. Thus this traditional art is moving towards oblivion, though there are families that have been engaged in it for four generations, and 2 or 3 troupes are now more then 120 yrs old. Puppeteers are mostly Hindus and scheduled caste with only a few of Muslims. The painting of the backdrop is done by the patuas. There is no strong religious bias or orthodoxy displayed by them. All the troupes show extreme reverence to the puppets which are often kept in sanctum in places considered sacred. The level of education among the troupes is very low. Most are illiterate, some have education upto primary level, a few are of secondary-education and very few graduates are among them. Though the puppeteers are enlisted as Scheduled Castes, they have not yet gain much benefit of it. They are eager to welcome any help from the Government.

নদীয়ার তারের পুতুলনাচের দলগুলি ১৯৮১ সাল থেকে সংগঠিত হচ্ছেন, সবকার ও জনসমক্ষে পুতুলনাচের সমস্যা তুলে ধরা হচ্ছে। ১৯৮১ সালে নদীয়ার পুতুলনাচ-অধ্যুষিত এলাকা বগুলায় গঠিত হয় 'পশ্চিমবঙ্গ পুতুলনাট্য সংঘ।' প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হলেন সুশান্ত হলাদার ও প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক হলেন অমরকৃষ্ণ দাস। সমিতি বিধি অনুযায়ী পঞ্জিভুক্ত, এস ৪২৫৮৭/৮৩-৮৪। আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ পুতুলনাট্য সংঘের উদ্যোগে দশটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুতুলনাট্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংঘের পক্ষ থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পুতুলনাচের দলের সমস্যাবলী তুলে ধরে সমাধান দাবী করা হয়েছে। নদীয়ার তারের পুতুলনাচের দলগুলি এই সংগঠনের পতাকাতলে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ। সংঘের রাজ্য সম্মেলনও নদীয়ার পুতুলনাচ-অধ্যুষিত এলাকায় বেশি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পুতুলনাট্য সংঘের উদ্যোগে পুতুলনাচের কলাকৌশল সম্পর্কে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান কর্মশালা সংগঠিত হয়েছে, নদীয়ার তারের পুতুলনাচের লোকশিল্পীরা এই কর্মশালায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন, প্রবীণেরা নবীনদের সঙ্গে ভাববিনিমিয় করেন, অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন, ফলে তরুণ সম্ভাবনাময় পুতুলনাচের লোকশিল্পীরা প্রাণিত হন।

পশ্চিমবঙ্গ পুতুলনাট্য সংঘ তাঁদের অনুষ্ঠানের পূর্বে মঞ্চে একদল পুতুল নাচিয়ে পুতুলের মুখে তুলে ধরেন নদীয়ার তারের সুতোয় টান৷ পুতুলনাচের কথা : 'আমরা সবাই পুতুল, শুধুমাত্র পুতুল হয়ে থাকলে আর চলছে না। তাই আমাদের কিছু কথা, আমাদেরই বলতে হবে।.....আপনারা শুনে খুশি হবেন, নদীয়া জেলার পুতুলনাচ ইংরেজী ম্যারিয়োনেট (MARIONETTE) গোত্রের অর্থাৎ উপর থেকে সুতো দিয়ে পুতুল নাচানো হয়। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে সূত্রধার, পঞ্চালিকা ও অন্যান্য নানা উৎস থেকে একথা গবেষকেরা প্রমাণ করেছেন যে এই জাতের পুতুলনাচ নাকি সবচেয়ে পুরোনো এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত। নদীয়ার পুতুলনাচ মানের দিক থেকেও বেশ উঁচুদরের। এই পুতুলনাচ শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের সুলভ মনোরঞ্জনের মাধ্যমই নয়। সেই সঙ্গে লোকশিক্ষার শক্তিশালী বাহন ও লোকনাট্যের অবহেলিত লোকশিল্পী বিশেষ। একমাত্র নদীয়া জেলাতেই বিচিত্র সব সুন্দর সুন্দর নামে প্রায় ১০০টি পুতুলনাচের দল রয়েছে। হাঁসখালি থানার মুড়াগাছা কলোনী, মিলননগর, ভবানীপুর, পূর্বপাড়া, হলদিপাড়া, শিবচন্দ্রপুর, দুর্গাপুর ও বগুলায় প্রায় ৫২টি এই ধরণের দল রয়েছে। রাণাঘাট থানার বড়বড়িয়া কলোনী, বরণবেড়িয়া, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণগঞ্জ

ও তেহট্ট থানা সহ আরো দু'একটি এলাকায় বাকী ৪৮টি। দলগুলো বছরের ৮ মাস প্রায় ৬০টি রকমারি পালা দেখিয়ে বেড়ায় মুখ্যত সারা পূর্বভারত জুড়ে। এই সব পালার আখ্যানবস্তু পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত থেকে সংগৃহীত হলেও গ্রাম বাংলার চিরাচরিত অমর গাথাগুলিও এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে রয়েছে। আবার হালফিল রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাও হয়ে উঠেছে এর উপজীব্য। এক একটি দল নানা ধরণের কাজের জন্যে ১২ থেকে ১৮ জন শিল্পী ও কর্মী সমন্বয়ে গঠিত। ঐতিহ্যমণ্ডিত পুতুলনাচের এই সব অখ্যাত ও অবজ্ঞাত গ্রামীণ গীতিকার, সুরকার ও পালাকারদের নীরব সাধনা ও প্রতিভা আজো যথাযথ মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। অবিশ্বাস্য মনে হলেও একথা সত্যি যে শুধুমাত্র নদীয়া জেলায় প্রায় দশ হাজার মানুষ এই লোকশিল্পের উপরে নির্ভরশীল—এঁদের সবাই প্রায় দারিদ্র্যসীমানার নিচে পড়ে থাকা তফসিলী জাতিভুক্ত। আমাদের সমস্যার শেষ নেই। এই সব সমস্যা সমাধানে সংশিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে কয়েক বছর হল পশ্চিমবঙ্গ পুতুলনাট্য সংঘ নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছি। আমাদের একান্ত অনুরোধ, আপনারা আমাদের সর্বপ্রকার সহায়তা ও সহানুভূতি দিয়ে একটি উপেক্ষিত লোকশিল্পকে বাঁচান।'

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ নদীয়া জেলার তারের পুতুলনাচের উন্নতি, ক্রমপ্রসারে ও সমস্যা দূরীকরণে নানা উদ্যোগ, কর্মসূচী ও কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছেন। ৩০-৩১ অক্টোবর ১৯৮৭ নদীয়া জেলার পুতুলনাচ অধ্যুষিত বগুলায় গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাচের শিল্পীদের নিয়ে শিল্পী ও শিল্পধারা সম্বন্ধে অবহিত হবার জন্য কর্মশালা আয়োজিত হয়েছিল, এই কর্মশালার তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে। ('ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাচ : শিল্পীজীবন ও শিল্পধারা সম্বন্ধে কিছু তথ্য'—'লোকশ্রুতি', ৮ম সংখ্যা, চৈত্র ১৩৯৭, মার্চ ১৯৯১)। নদীয়া জেলার স্বরূপগঞ্জে ১৭-২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ ও চাকদহে ২৩-২৭ জানুয়ারি ১৯৯১ পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতিকেন্দ্র ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ উদ্যোগে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাচের সাড়ম্বর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২২ জুলাই থেকে ৫ আগষ্ট ১৯৯০ রাণাঘাটে পক্ষকালব্যাপী পুতুলনাচের নানা শৈলীব লোকশিল্পীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। নদীয়ার তারের পুতুলনাচ সহ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ডাঙের পুতুলনাচ ও মেদিনীপুরের বেণীপুতুলনাচের ১৯ জন পুতুলনাচশিল্পীকে সনাতনী পুতুলনাচের সঙ্গে সমসাময়িক পুতুলনাচের সমন্বয়সাধনে উন্নত পুতুলনাচ সৃষ্টিকল্পেই এই বিশেষ প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়েছিল। তারের পুতুলনাচশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন নদীয়ার গোপাল অধিকারী, সুখরঞ্জন রায়, হরিপদ বিশ্বাস, শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মোহনলাল বৈরাগী, বীরভূমের জগদীশ মজুমদার বাঁকুড়ার স্বপন ব্যানার্জি ও উত্তর চব্বিশ পরগণার কমল কুণ্ডু। বেণীপুতুলনাচ শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন মেদিনীপুরের অজয় ঘোড়ই, মুর্শিদাবাদের চন্দ্রশেখর ঘোষ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার দীপক মণ্ডল ও ভীষ্মদেব হালদার। ডাঙের পুতুলনাচ শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জলধর

মণ্ডল, শম্ভুনাথ মণ্ডল, পঙ্কজকুমার ঘোষ, নিরাপদ মণ্ডল, রবীন্দ্রনাথ হালদার, সুদর্শন হালদার ও শুকদেব সরদার। প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন সমসাময়িক পুতুলনাচের খ্যাতনামা শিল্পীদ্বয় সুরেশ দত্ত ও হীরেন ভট্টাচার্য, তাঁদের সঙ্গে ছিলেন সুদীপ গুপ্ত, দেবেশ চক্রবর্তী ও শান্তিময় রায় (মূকাভিনয়)। সঙ্গীত প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন উৎপলেন্দু চৌধুরী, আলোকসম্পাত প্রশিক্ষণে দায়িত্বে ছিলেন জয় সেন এবং হরবোলা ছিলেন সুনীল আদক। ভাওইয়া গানের শিল্পী সুখবিলাস বর্মাও প্রশিক্ষক ছিলেন। পুতুলনাচের প্রবীণ শিল্পী জীতেন হালদার (তার), জগদীশ হালদার (ডাঙ) ও রামপদ ঘোড়ুই (বেণী) প্রশিক্ষণ দেন। প্রশিক্ষণ-সংযোজক-সমন্বয়ী ছিলেন সুশান্ত হালদার (পশ্চিমবঙ্গ পুতুলনাট্য সংঘ) ও মোহিত রায় (সদস্য, জেলা লোকসংস্কৃতি পর্ষদ, নদীয়া তথা সদস্য, পুতুলনাচের ওয়ার্কিং গ্রুপ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ)। এই প্রশিক্ষণে সাক্ষরতা প্রসারণ বিষয়ক পুতুলনাচের পালা 'ময়নাবৌয়ে-র পাঠশালা' প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পীরা অনবদ্য পরিবেশন করেন। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পীভুক্ত নদীয়ার তারের পুতুলনাচের কয়েকটি দল নানা নামে ঐ পালাটি জনসমক্ষে পরিবেশন করেছেন, পালাগুলি সমাদৃতও হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ আয়োজিত পঞ্চায়েত, জেলা, আঞ্চলিক ও রাজ্য লোকসংস্কৃতি উৎসবে নদীয়ার তারের পুতুলনাচপালা পরিবেশিত হয়েছে। নদীয়ার তারের পুতুলনাচের অপরূপ কয়েকটি পুতুল কলকাতায় বেহালায় অবস্থিত রাজ্য লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে।

নদীয়ায় অনুষ্ঠিত উল্লিখিত কর্মশালা, প্রশিক্ষণ শিবির ও উৎসবে প্রবীণ ও নবীন তারের পুতুলনাচের শিল্পীরা পুতুলনাচের উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগকে স্বাগত ও সমর্থন জানিয়ে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে ঐতিহ্যবাহী সনাতনী পুতুলনাচের রক্ষণশীলতায় ও গতানুগতিকতায় আচ্ছন্ন থাকলে উন্নতি ঘটবে না, পুতুলনাচকে যুগোপযোগী করে তোলার প্রয়োজনে সমসাময়িক পুতুলনাচের উন্নত কলাকৌশল আয়ত্ত করতে হবে, অধিগত করতে হবে আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগকৌশল, পুতুলনাচের পালার বিষয়বস্তু নির্বাচনে অবক্ষয়ী চেতনা সম্বন্ধে পুতুলনাচের শিল্পীদের সতর্ক সচেতন থাকতে হবে, পুতুলনাচের নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধারকল্পে বা সুস্বাস্থ্যপ্রদ গড়ে তুলতে মানুষের রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে ও জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য করে উন্নত কলাকৌশল ব্যবহার করতে হবে, অন্যান্য লোকসংস্কৃতি ধারার মতো পুতুলনাচকেও সমাজ মানসিকতার সঙ্গে সাযুজ্যে-অভেদে-সহযোগিতায় স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখতে হবে। আর ভাবের ঘরে চুরি নয়, আজও সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে পুতুলনাচের আকর্ষণ, সমাদর ও গ্রহণযোগ্যতা থাকায় মানুষের জন্য মানুষের মনোরঞ্জনে-শিক্ষায়-কল্যাণে পুতুলনাচের সার্বিক উন্নতি ঘটাতে হবে। উল্লেখ্য যে রাণাঘাটে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণশিবিরে সনাতনী পুতুলনাচের শিল্পীদের উন্নত ও আকর্ষণীয় পুতুল সঞ্চালন সহ মুদ্রিত (বা পাণ্ডুলিপি) নাটকের পুতুলপালায় রূপান্তর, আলোকসম্পাত ও আবহসঙ্গীতাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

৩০-৩১ অক্টোবর ১৯৮৭ নদীয়ার বগুলায় অনুষ্ঠিত পুতুলনাচের কর্মশালায় নদীয়ার তারের পুতুলনাচের ২৯ জন শিল্পীকর্মী প্রমুখ যোগদান করেন (কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীর মোট সংখ্যা ৫৫ জন)। কর্মশালার প্রতিবেদন ('লোকশ্রুতি', ৮ম সংখ্যা চৈত্র ১৩৯৭, মার্চ ১৯৯১ প্রকাশিত) অনুযায়ী নদীয়ার ২৯ জন (একজন মহিলা সহ) পুতুলনাচের সঙ্গে যুক্তদের মধ্যে ৭ জনের একমাত্র জীবিকা পুতুলনাচ, ১৬ জনের জীবিকা পুতুলনাচের সঙ্গে চাষবাস, ২ জনের জীবিকা পুতুলনাচের সঙ্গে ব্যবসা, ২ জনের জীবিকা পুতুলনাচের সঙ্গে ক্ষেতমজুরের কাজ, ১ জনের জীবিকা পুতুলনাচের সঙ্গে চাষবাস ও ব্যবসা ও বাকি ১ জনের জীবিকা নেই, অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ। পুতুলনাচের দলের আর্থিক সংকটের জন্য, আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হওয়ার জন্য, আর্থিক অনটন ও পরিচালনার অক্ষমতার জন্য, আর্থিক ক্ষতি হবার আশঙ্কায়, মালিকের মৃত্যুতে যোগ্য উত্তরাধিকরী না থাকায় ও দল পরিচালনায় ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায় পুতুলনাচের দল বেচাকেনা হয়ে থাকে বলে অংশগ্রহণকারীরা জানান।

ভারতের রাজস্থানে মাধ্যমিক স্তরে নবম-দশম শ্রেণীতে পুতুলনাচ পাঠ্যসূচীভুক্ত ('Puppet Theatre in India'—by A.L. Samar গ্রন্থ অনুযায়ী)। পশ্চিমবঙ্গের পুতুলনাচ-অধ্যুষিত জেলাগুলিতে অনুরূপভাব মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচীভুক্ত করার কথাও শিল্পীরা বলেছেন।

সরকারী অনুদান বা ভর্তুকীর মাধ্যমে, পুতুলনাচের উন্নতি ঘটাবার মাধ্যমে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে, গুণী শিল্পীর হাতে দল পরিচালনার ভার পেলে, আর্থিক যোগানদারের সহায়তা বৃদ্ধি পেলে, সংকটকালে সরকারী অনুদান পেলে, ব্যাঙ্ক থেকে স্বল্পসুদে ঋণ পেলে, অপসংস্কৃতি দূর হলে, আর্থিক অনটনের প্রতিকার হলে, অনুষ্ঠান করার জন্য অনুমতি পেতে জটিলতা বন্ধ হলে, সরকারী সাহায্যে প্রদর্শনী বেশি হলে, আধুনিকীকরণ ও উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যার সফল প্রয়োগে, বিজ্ঞানসম্মত সাহায্য পেলে, পুতুলনাচের উপযুক্ত সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হলে, সরকার বিনাসুদে অর্থ ঋণ দিলে, সরকারী আনুকূল্য পেলে, আধুনিক জনপ্রিয় পুতুলনাচ দেখাতে পারলে ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পুতুলনাচের দল স্বাবলম্বী হলে পুতুলনাচের দলের বেচাকেনা রোধ করা যায় বলে অংশগ্রহণকারীরা কর্মশালায় জানান। জানা যায় যে পুতুলনাচের দল পরিচালনা করতে গিয়ে সকলেই ঋণগ্রস্ত হন নি, ঋণের পরিমাণ ২০০ টাকা ৮০০০ টাকা। নদীয়ার ২৯ জনই ছিলেন সাক্ষর। নদীয়ার পুতুলনাচের শিল্পীদের সন্তানেরাও কেউ নিরক্ষর নয়। নদীয়ার পুতুলনাচের সঙ্গে যুক্ত আছেন ৫ বছর থেকে ৫৯ বছর পর্যন্ত। অধিকাংশই জানান যে পুতুলনাচের পালার বিষয়বস্তুর পরিবর্তন হচ্ছে, দর্শক বাড়ছে এবং জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। দর্শকদের চাহিদাক্রম: পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক ও অন্যান্য। পুতুলনাচের দলের অবনতির কারণ প্রসঙ্গে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে জানা যায়: দূরদর্শন ও অন্যান্য টি. ভি. এবং ভি. ডি. ও. ইত্যাদির প্রভাবে সনাতনী পুতুলনাচের আকর্ষণ বিনষ্ট হচ্ছে, এইসব আকর্ষণীয় মাধ্যমের

সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্য আর্থিক সঙ্গতির তীব্র অভাবে, আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হওয়ায় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে, অর্থনৈতিক সংকটে, অপসংস্কৃতির জন্য, অনিশ্চিত আয়ের জন্য পুতুলনাচের শিল্পী কর্মীরা মনোযোগী নয়, অনাগ্রহী ('অনাহারে-অর্ধাহারে থেকে শিল্পীকর্ম করা যায় না'), সাবেকি সাজসরঞ্জামের জন্য ('মান্ধাতা আমলের দৃশ্যপট আর হ্যাজাকের আলোয় শুধু পুতুল নাচানোয় দর্শকচিত্ত জয় করা যায় না'), সরকারী অনুদানের অভাবে, উপযুক্ত যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের অভাবে, পুরাতন সাবেকি পদ্ধতির পরিবর্তন না হওয়ার জন্য, উপযুক্ত বসার জায়গা না থাকায় দর্শক আসে না ('এখন গ্রামাঞ্চলেও ফুলপ্যান্টের ব্যাপক প্রচলন হওয়ায় মাটিতে চটের উপর বসতেও অসুবিধা হয়'), শিল্পীদের প্রতি সরকারের দৃষ্টির অভাবে, গ্রামাঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক দুর্বল অবস্থার জন্য, কর্মচারীদের (পুতুলনাচের দলের) অসহযোগিতার জন্য, পুতুলনাচের শিল্পীকর্মীদের চরম অর্থনৈতিক সংকট হেতু, একই অঞ্চলে বারবার পুতুলনাচ দেখানো যায় না ও স্থানীয় পুতুলনাচের দল বলে অনেকেই একঘেয়েমি বোধ করে পুতুলনাচ দেখতে আসে না। ('গেঁয়ো যোগী ভিক্ পায় না')।

বহির্বঙ্গে বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলে তাঁরা পুতুলনাচ দেখিয়ে থাকেন প্রধানত বিহার, অসম ও উড়িষ্যায়।

পুতুলনাচ পরিবেশনের ক্ষেত্রে জটিলতা বিষয়ে অংশগ্রহণকারীরা জানান: পূজা বা ক্লাবের চাঁদা নিয়ে ঝামেলায় পড়তে হয় (স্থানীয় মাস্তানবাহিনী একটা অজুহাত বা উপলক্ষে দেখিয়ে বলপূর্বক মোটা টাকার চাঁদা দাবী করে, তাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না), পুতুলনাচের পুতুলসহ মঞ্চাদি সরঞ্জামাদি জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যানবাহনের সমস্যা, বিনা দর্শনীতে পুতুলনাচ দেখার জন্য অনেকে ঝামেলা করে, থানা, প্রশাসন ও পঞ্চায়েত-পুরসভার কাছ থেকে অনুমতি পেতে খুবই অসুবিধা হয়, পুলিশ অনেকক্ষেত্রে ঝামেলায় ফেলে, গ্রামাঞ্চলে গ্রামপঞ্চায়েতের অসহযোগিতা, মাস্তানেরা টাকাপয়সাসহ পুতুল কেড়ে নেয়, বিদ্যুৎ জনিত সমস্যা, অনুষ্ঠানস্থলের জন্য প্রচুর অর্থ দিতে হয়, হ্যাজাকের কেরোসিন তেল ঠিকমতো পাওয়া যায় না। বহির্বঙ্গে সমস্যা হল: পঞ্চায়েত টাকা দাবী করে, ভাষাগত অসুবিধা, খাবারেব দোকানীবা বেশি দাম নেয়, বাংলাভাষায় পুতুলনাচ অনেক অঞ্চলে অনাগ্রহের সৃষ্টি করছে ('কোন কোন অঞ্চলে তীব্র প্রাদেশিকতাবাদীরা বিঘ্ন ঘটায়') ও বাংলাভাষাবিরোধীরা অধুনা বিদ্বেষের বিষ ছড়াচ্ছে।

পুতুলনাচের জটিলতা বা সমস্যা নিরসন কল্পে অংশগ্রহণকারীবা জানিয়েছেন: যেখানে পুতুলনাচ দেখানো হয় সেখানে রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে ও স্থানীয় আধিবাসীদের সহযোগিতা পেলে, পুতুলনাচের স্থানীয় উদ্যোক্তা-সংগঠকেরা যত্নশীল হলে, লাইসেন্স প্রথার সরলীকরণ হলে, বহির্বঙ্গে অবঙ্গভাষী অঞ্চলে দোভাষীর সহযোগিতা পেলে, সরকারী আনুকূল্য পেলে, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে অনুমতি সহজসরলভাবে পেলে, অনুষ্ঠানের জন্য চুক্তি প্রথা রদ হলে, সরকারী তত্ত্বাবধান পেলে ও বহির্বঙ্গে পুতুলনাচ দেখানোর সর্বভারতীয়

অনুমতিপত্র পেলে সমস্যার নিরসন হতে পারে।

পুতুলনাচের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীরা অধিকাংশই আশাবাদী এবং উন্নতিও সম্ভব বলে মনে করেন ; আবার কেউ কেউ পুতুলনাচের ভবিষ্যৎ নেই বলে গভীর নিরাশায় আচ্ছন্ন। অধিকাংশই পেশাদারী দল গঠনে আগ্রহী এবং তাঁরা মনে করেন যে দল পেশাদারী হলেই উন্নতি সম্ভব। শৌখিন দল এখন অচল বলে অনেকে মনে করেন।

পুতুলনাচের উন্নতিসাধনে পুতুলনাচের শিল্পীকর্মীদের দায়িত্ব-কর্তব্য প্রসঙ্গে অংশগ্রহণকারীরা জানান : পুতুলনাচের শিল্পীদের সংগঠিত-ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, পুতুলনাচের মান উন্নয়নে নিজেদের চেষ্টা করতে হবে, আধুনিক পদ্ধতিতে কলাকৌশল অর্জন করতে হবে, পুতুলনাচ আকাদেমী গঠন করতে হবে, পুতুলনাচের স্থায়ী মঞ্চ গঠন করতে হবে, নিজেরা উদ্যোগী হয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, স্থানীয় প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় বস্তুনিষ্ঠ জনমুখী পুতুলনাচের নতুনপালা রচনা ও প্রয়োগ করতে হবে, ঐতিহ্য তথা সনাতনী ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, আকর্ষণীয় দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যপট সমৃদ্ধ পালা তৈরি করতে হবে, নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে সাধারণ শিক্ষা ও শিল্পশিক্ষার মান বৃদ্ধি করতে হবে, নতুন ভাবনা চিন্তার যথোপযুক্ত প্রয়োগ করতে হবে, শিল্পদক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে, পারস্পরিক সহযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি করতে হবে, শিল্পকর্মে অধিক যত্নবান ও আন্তরিক হতে হবে, নিজেদের যোগ্যতার মান বৃদ্ধি করতে হবে, নিজেরা উদ্যোগী হয়ে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, শিল্প বিষয়ে যথেষ্ট অনুশীলন করতে হবে, পুতুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে হবে, পুতুলনাচের শিল্পীকর্মীদের নিজেদের নিয়ে নানা সমবায় সমিতি গঠন করতে হবে, মালিক-শ্রমিক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতি না ঘটিয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে, কোন রকম আভ্যন্তরীণ বিবাদ বিরোধ পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করতে হবে, দলের মালিকের প্রতি শিল্পীকর্মীদের পূর্ণ সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে ও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে, শিল্পের স্বার্থে প্রচুর শ্রমদান করতে হবে ও পরিশ্রম করতে হবে, যুগোপযোগী নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক পালা তৈরি করতে হবে ও সাম্প্রতিক সার্বজনীন সমস্যার উত্তরণমুখী পালা সৃষ্টি করতে হবে (যেমন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-জাতীয় সংহতি মূলক, নেশা ও পণপ্রথাবিরোধীমূলক), সংঘবদ্ধ হয়ে শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করতে হবে, শিল্পের গুণগত মান বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে, পুতুলনাচের দলের কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন করে সংস্থার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হতে হবে ও পুতুলনাচ শিল্পের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বিদেশে কমপিউটার প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে পুতুলনাচকে উন্নত করা হয়েছে, ভবিষ্যতে এখানেও এই প্রযুক্তির সহায়তা নিতে হবে।

পুতুলনাচের উন্নতির জন্য সরকারের করণীয় প্রসঙ্গে অংশগ্রহণকারীরা বলেন : শিল্পীদের আর্থিক অনুদান দিতে হবে, সরকারী উদ্যোগে পুতুলনাচ অধ্যুষিত এলাকায় মাঝে মাঝে কর্মশালা করতে হবে, অনুষ্ঠানের জন্য অনুমতি পাওয়ার ক্ষেত্রে সহজ পদ্ধতি চালু করতে

হবে, শিল্পীদের বিভিন্ন শিল্পমেলায়, লোকসংস্কৃতি উৎসবে ও সাধারণ উৎসবে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে, পুতুলনাচের দলকে মাস্তানদের কবল থেকে রক্ষা করতে হবে, দলের পঞ্জিভুক্তি সহজসাধ্য করতে হবে, বিনামূল্যে জেনারেটর প্রদান করতে হবে প্রত্যেক দলকে, অল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে পরিশোধ্য ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারী উদ্যোগে পুতুলনাচের ব্যাপক প্রদর্শনের আয়োজন করতে হবে, অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রশাসনিক সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে, ফি ছাড়া অনুষ্ঠান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে, উৎকোচ গ্রহণ ও প্রদান বন্ধ করতে হবে, চুঙ্গি কর রদ করতে হবে, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সহজ অনুমতি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে, বহির্বঙ্গের নানা স্থানে পুতুলনাচ দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে সরকারী উদ্যোগে, বহির্ভারতে পুতুলনাচের দলকে সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচীতে প্রদর্শনের জন্য পাঠাতে হবে, আধুনিক প্রশিক্ষণের জন্য সাহায্য দিতে হবে, শিল্পীদের শিক্ষার জন্য স্থায়ী প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে, সরকারী উদ্যোগে পুতুলনাচের দল গঠন করতে হবে, শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা বৃদ্ধি করতে হবে, সরকারকে পুতুলনাচের প্রচারে প্রসারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, শিল্পীদের ভুর্তুকী দিতে হবে, শিল্পীদের চিকিৎসার ভার সরকারকে বহন করতে হবে, শিল্পীকর্মীদের দুঃসময়ে বেতন দান বা বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। উৎসবকালীন অনুদান দিতে হবে, পুতুলনাচের দর্শনীর মূল্য বৃদ্ধিতে সরকারী সাহায্য দিতে হবে, দুঃস্থশিল্পীদের অনুদান মাসিক বাৎসরিক বৃত্তি-ভাতা দিতে হবে, দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানের ব্যবস্থা করতে হবে, ভি. ডি. ও. বন্ধ করতে হবে ও সমস্ত রকম সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

পুতুলনাচ শিল্পের স্বার্থে স্থায়ী মঞ্চ ও কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠনের পক্ষে অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী বলেছেন : সরকারী সাহায্যে ও সরকারী তত্ত্বাবধানে পুতুলনাচের বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি নিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন করতে হবে, পুতুলনাচের দলগুলিকে এই সংগঠনের মধ্যে আনতে হবে, অঞ্চল, জেলা ও রাজ্যভিত্তিক সংস্থা গঠন করতে হবে, সংস্থার স্থায়ী কার্যালয় বা কেন্দ্র থাকবে, সুসংগঠিত সদস্য নিয়ে সংস্থা গঠিত হবে, পুতুলনাচের সমস্ত দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে সংস্থা গঠন করতে হবে, সমস্ত শিল্পীদের সভা ডেকে সংস্থা তৈরি করতে হবে, সংস্থার জন্য দক্ষ সাংগঠনিক পরিচালকের প্রয়োজন, সরকারের সুপরামর্শে সংস্থা গঠিত হবে, সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন, রাজ্য সরকারের মাধ্যমেই সংস্থা গঠন সম্ভব, প্রতিটি পুতুলনাচের দল থেকে দুইজন প্রতিনিধি সংস্থায় থাকবে, প্রত্যেক সদস্যের ভর্তি ফি ও মাসিক চাঁদা থাকবে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংস্থার সঞ্চালন হবে, সমস্ত মালিক-শ্রমিকদের সংস্থাভুক্ত করে একত্রিত করতে হবে, স্থায়ীমঞ্চে প্রত্যেক পুতুলনাচের দলকে প্রদর্শনের সুযোগ দিতে হবে, সংস্থা গঠনে বেসরকারী উদ্যোগের সাহায্য নিতে হবে ও গণউদ্যোগকে কাজে লাগাতে হবে।

পুতুলনাচ প্রসারে উন্নয়নে অংশগ্রহণকারীরা মতামত দিয়েছেন : অবিলম্বে সরকার থেকে

সার্বিক সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন, পুতুলনাচের উন্নতিকল্পে অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ, শিল্পীদের যাতায়াতের ভাড়া ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থা, ভি. ডি. ও.- টি. ভি.—সিনেমার উপর করের হার বৃদ্ধি করতে হবে শিল্পের উন্নতির জন্য ব্যাপক অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে, কেরোসিন তেলের অভাব দূর করতে হবে, সরকারি অনুমতি দানের সুব্যবস্থা করতে হবে, টি. ভি.-তে সিনেমা সন্ধ্যায় বন্ধ রাখতে হবে— বেশি রাতে দেখাতে হবে, পুতুলনাচের শিল্পীরা সমাজে যাতে যথাযোগ্য মর্যাদা পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে, গ্রামপঞ্চায়েতকে অনুমতি দানের ব্যবস্থা নিতে হবে, বিভিন্ন পর্যায়ে উৎকোচ প্রদানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে, বৈদ্যুতিক লাইনের জন্য (সাময়িক ভাবে) জমা দেওয়া টাকা (জামানতের টাকা) সময় মতো ফেরৎ পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, স্থানীয় সমাজবিরোধীদের দমনের ব্যবস্থা করতে হবে, চুক্তিমাফিক টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, উন্নতমানের পুতুলনাচের ক্ষেত্রের এলাকা প্রসারিত করতে হবে। হঠকারী মানুষের ঝামেলা দূর করতে হবে, প্রদর্শনীর জন্য লাইসেন্স কর উঠিয়ে দিতে হবে, বেআইনীভাবে বিনা সরকারি অনুমতিতে চলা ভি. ডি. ও. হল বা কক্ষ বন্ধ করতে হবে—কঠোর সাজা দিতে হবে, পুতুলনাচের আধুনিকীকরণ করতে হবে, যুগের মানসিকতার সঙ্গে প্রযুক্তিগত কলাকৌশল বৃদ্ধি করতে হবে, অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রশাসনিক সাহায্য করতে হবে, এই লোকনাট্যশিল্পকে আধুনিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, আধুনিক সিনেমা, টি. ভি-র সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো আকর্ষণীয় পুতুলনাচের দল ও পালা তৈরি করতে হবে, গ্রামের অর্থাভাব মোচন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণের সুব্যবস্থা করতে হবে (প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য যে নদীয়া জেলার হাঁসখালি থানার পুতুলনাচের দল-শিল্পী অধ্যুষিত মুড়াগাছা কলোনী অতিবর্ষণে ও চূর্ণি নদীর প্লাবনে জলমগ্ন হয়ে থাকে, পুতুলনাচের দল-শিল্পীরা বিপন্ন হয়, ত্রাণের ব্যবস্থা হয় না, হলেও প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত।) ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ব্যাপক গণপ্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

গ্রামীণ মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে বা চলতি সুদে ঋণ গ্রহণ করে, নিজ জমি, সোনারূপার গহনাদি বিক্রয় করে বা বন্ধক দিয়ে, ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে ঋণ নিয়ে, নিজ সঞ্চিত অর্থে পুতুলনাচের দলগঠনে অর্থ সংগ্রহের উপায় বলে অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন। উত্তরাধিকার সূত্রে পুতুলনাচের দলের মালিক হলে দলে পুতুল ও সরঞ্জামাদি পাওয়া যায়। পুরুষানুক্রমে অনেকে পুতুলনাচের সঙ্গে যুক্ত হন। আবার পুতুলনাচের শিল্পীকর্মীদের অনেকে নিজেদের সন্তানদের যুক্ত করতে অনাগ্রহী, অন্য জীবিকায় যুক্ত করার চেষ্টা করেন কারণ তাঁদের মতে, 'পুতুলনাচিয়ে পেটে ভাত হবে না।'

পুতুলনাচের পরিবর্তন প্রসঙ্গে অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন :

দর্শকেরা সাম্প্রতিক সামাজিক বিষয়বস্তুর দিকে ঝুঁকছে, আধুনিক যাত্রার ঢঙে পালা সাজাতে হচ্ছে, ভাঙচুর মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে ঘটনার পরিবর্তন করতে হচ্ছে, মঞ্চসজ্জা ও আলোকসজ্জার আমূল পরিবর্তন করা হচ্ছে, সমাজের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন হচ্ছে,

পুতুলনাচের আধুনিক কলাকৌশল আনা হচ্ছে, রাজনৈতিক বিষয়ের আকর্ষণ বাড়ছে, বিশ্বঘটনাপ্রবাহনির্ভরও পুতুলপালা করতে হচ্ছে (ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধভিত্তিক পালার চাহিদা যাত্রার অনুকরণে, বলা বাহুল্য শুধুমাত্র পটকা ফাটিয়ে যুদ্ধের আবহ সৃষ্টি করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় থাকে না), যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পালা তৈরি হচ্ছে, পৌরাণিক থেকে সামাজিক পালার দিকে ঝুঁকছে, সামাজিক পালার মধ্যে দিয়ে বর্তমানকালের সমস্যাকে তুলে ধরা হচ্ছে, পৌরাণিক পালার আধুনিকীকরণ করতে হচ্ছে (দূরদর্শনে রামায়ণ-মহাভারত চলার পর রামায়ণ মহাভারতের খণ্ডাংশভিত্তিক পালার চাহিদা বাড়ছে), কেউ কেউ শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের কাহিনীভিত্তিক পালা করছে, রহস্য-রোমাঞ্চ বা ডিটেকটিভ পালার সমাদর বাড়ছে, সিনেমা যাত্রা নির্ভর পালা করতে হচ্ছে সাম্প্রতিক ঘটনানির্ভর (প্রতিদিনের সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রকাশ হবার পর) পালা তৈরি করতে হচ্ছে।

পুতুলনাচের আকর্ষণের কারণ প্রসঙ্গে অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন:

উন্নতমানের নাচ দেখার জন্য বর্তমানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচ দেখানোর জন্য, গরিব মানুষেরা কম খরচে আনন্দ উপভোগ করতে পারে, পুতুলনাচের কলাকৌশল সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে, আধুনিক ঘটনা নির্ভর পালা দেখার জন্য, মানুষের মনের চাহিদা-প্রয়োজন মেটাচ্ছে বলে, নতুন স্থানে ও বিষয়বস্তুর পরিবর্তন করা হলে, পুতুলনাচে জমজমাট গানবাজনা থাকার জন্য, পুতুলনাচে পৌরাণিক-ঐতিহাসিক পালা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে বলে, সামাজিক পালায় দর্শকেরা নিজেরা একাত্ম হয়ে যায় বলে, আধুনিক কায়দায় পুতুলনাচ প্রদর্শনের জন্য, সিনেমার বিষয়বস্তু অনুকরণের জন্য ('বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না' পুতুলপালা, ঐ নামের সুপারহিট সিনেমার জনপ্রিয়তার জন্য), বসার জন্য চেয়ার বেঞ্চি থাকার জন্য, জনপ্রিয় সিনেমাকাহিনী পুতুলপালায় দেখানোর জন্য, নতুন পর্দা-দৃশ্যপট ও নতুনভাবে আলোকসম্পাতের জন্য এবং যে সব এলাকায় ভি. ডি. ও. হল নেই, অন্য কোন লোকরঞ্জন অনুষ্ঠানও হয় না—এমন এলাকায় পুতুলনাচ সমাদৃত হয়।

অংশগ্রহণকারীরা সরকারের নিয়মিত অর্থ সাহায্য, পরামর্শ সাহায্য, সরকারী অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ, সরকারি প্রচার মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত করার সুযোগ, সরকার কর্তৃক পুতুলনাচের পালার প্রতিযোগিতার আয়োজন চেয়েছেন।

অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন যে তাঁরা সমাজের অংশ, সমাজের কাছে দায়বদ্ধ, সমাজের কাছে সৃজনশীল পুতুলনাচের শিল্পীদের দায়দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে, শিল্পের প্রয়োজনে যে কোন উদ্যোগ নিতে প্রস্তুত হতে হবে, তাঁদের সরকারের কাছে মানুষের সমস্যা পুতুলপালার মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে আবার সরকারের কাছে পুতুলনাচের সমস্যাও তুলে ধরতে হবে। মানুষের মধ্যেচেতনাসঞ্চারে পুতুলপালা পরিবেশনে তাঁরা দায়িত্বশীল হবেন, সরকারের আহ্বানে সাড়া দিতে হবে, শিল্পকে উন্নত করার জন্য নিরলস শ্রমদান করতে হবে, শ্রমদক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে ও মানুষের কাছে আরও উন্নত মানের পুতুলনাচ

দেখাতে হবে। অনেকেই মনে করেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুতুলনাচ ও পুতুলনাচের লোকশিল্পীদের ব্যাপারে উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

পুতুলনাচের দল প্রয়োজিত পুতুলনাচের পালার গঠনমূলক সমালোচনা সংবাদপত্রাদি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে শিল্পীরা পালা উন্নত করতে পারেন, সংশোধন সংযোজন করতে পারেন, প্রাণিতও হতে পারেন বলে জানিয়েছেন। মফস্বলের পত্রপত্রিকায় এই ধরণের আলোচনা প্রকাশিত হতে পারে।

নদীয়ার তারের সুতোয় টানা পুতুলনাচ সমস্যা জর্জরিত হলেও তার ভবিষ্যৎ নেই—একথা বলা যায় না। একথা ঠিক যে দেশিবিদেশি কেব্‌ল টি. ভি. নেটওয়ার্কের ও ভি. ডি. ও.-এর আকর্ষণীয়-বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা অনুষ্ঠানের মাদকতায় ক্রমেই মানুষ আচ্ছন্ন হচ্ছে, দর্শকদের দৃষ্টি রুচি ও মনন গ্রাস করছে। তা সত্ত্বেও তারের পুতুলনাচের উন্নতি ও প্রসার অসম্ভব নয়। টি. ভি.-ভি. ডি. ও.-র সঙ্গে লড়াই আরও তীব্র হবে। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের (Electronic Media) দর্শক অলসবিলাসী। তাদের কাছে পুতুলনাচের সমাদর না থাকতে পারে, গ্রামের মানুষের কাছে পুতুলনাচের সমাদর আছে, আছে আকর্ষণ। গ্রামের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ স্বশ্রমজীবী, গ্রামের মানুষ অলসবিলাসী নয়। ভি. ডি. ও. সমস্ত গ্রামকে গ্রাস করতে পারে নি। সমস্ত গ্রামে এখনও টি. ভি. পৌঁছায় নি। টি. ভি. -তে বিনোদনের মাত্রা ক্রমবর্ধমান। হিন্দির আধিপত্য, গ্রামের মানুষের কাছে ভাষাগত সংযোগের (Communication) অসুবিধা আছে। Communication -এর শর্ত হল : 'The encoder can encodes and the decoder can decodes — only in the terms of experience he has had.' টি. ভি.-র হিন্দি ভাষানির্ভর অগভীর বিনোদন মানুষকে কিছুদিনের জন্য আকৃষ্ট করতে পারে, চিরকালের জন্য নয়। কবি নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মতে : 'শিল্প যখন বিনোদন হয়ে যায়, মানুষ টানতে পারে না।' (আনন্দবাজার পত্রিকা। 'পত্রিকা' ক্রোড়পত্র। পৃষ্ঠা-৩। ২০ আগষ্ট ১৯৯৪: সাক্ষাৎকার মন্তব্য)। পুতুলনাচ গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে শুধুমাত্র বিনোদন নয়, লোকশিক্ষার বাহন ও প্রেরণার উপাদান। আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখেছি : নদীয়ার গ্রামাঞ্চলে পুতুলনাচের অনুষ্ঠানে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ আয়োজিত পুতুলনাচের নানা উৎসব-অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক দর্শক সমাগম আজও হয়ে থাকে। নদীয়ার বগুলা পুতুলনাচ অধ্যুষিত, পুতুলনাচের অনেকগুলি দল সেখানে আছে। ধারণা করা হয়েছিল যে বগুলায় পুতুলনাচের অনুষ্ঠানে দর্শক সমাগম হবে না। আমাদের সমস্ত ধারণা পালটে যায়—সেখানে পুতুলনাচের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে। বিশাল মাঠে ছিল এই পুতুলনাচের অনুষ্ঠান— সন্ধ্যা থেকে অধিক রাত্রি পর্যন্ত অগণিত মানুষের উপস্থিতি আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। এই উপস্থিতিই প্রমাণ করে যে পুতুলনাচ এখনও সাধারণ মানুষের কাছে সমাদৃত — আকর্ষণীয়। পুতুলনাচ গ্রামে দর্শকধন্য হওয়ার কারণ শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য নয়— মনোরঞ্জনের জন্য নয়। গ্রামের সাধারণ মানুষের ভাবনার রূপ

পুতুলনাচে সাধারণ মানুষ দেখতে পায়— মানুষের ইচ্ছার দাবি পুতুলনাচে মেটে — মানুষের মনের চাহিদা পূর্ণ হয়। এ কারণেই মানুষ পুতুলনাচকে গ্রহণ করে। সাধারণ মানুষ গ্রহণে মানসিক প্রস্তুত হলেই যে কোন শিল্পকর্ম শিল্পসৃষ্টি শিল্পমাধ্যম সফল হয়— যে কোন শিল্পকর্মের সাফল্যের পিছনেই এই যুক্তি ক্রিয়াশীল। তাই পুতুলনাচের শিল্পীদের সাধারণ মানুষের পুতুলনাচের প্রতি সমাদরের যথোচিত মর্যাদা দিয়ে পুতুলনাচের পালা সৃষ্টি করতে হবে। শিল্পী শুধু শিল্পের কাছে নয়, মানুষের কাছে দায়বদ্ধ। এই দায়বদ্ধতায় সচেতন হতে হবে পুতুলনাচের লোকশিল্পীদের। বৈদ্যুতিন মাধ্যমের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামে চিরায়ত লোকসংস্কৃতির জয় সুনিশ্চিত। পুতুলনাচের ভবিষ্যৎ নেই—এই বোধে-চেতনায় আচ্ছন্ন থাকলে পুতুলনাচের লোকশিল্পীদের শ্রেণীচেতনায় লোকশিল্পীসত্তা প্রকৃত সংগ্রামীর রূপ নেবে না, নিতে পারে না। ঐতিহ্যকে বর্জন করে নয়, ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করে নয়, ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে নির্ভর করে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চললে লোকসংস্কৃতির মৃত্যু নেই, রূপান্তর হয় মাত্র, নবায়ন ঘটে মাত্র।

আমরা নির্দ্বিধভাবে বিশ্বাস করি—মনে করি—লোকসংস্কৃতির অঙ্গ অনুপম লোকনাট্য পুতুলনাচের অপমৃত্যু ঘটবে না, ঘটতে পারে না। মানুষই পুতুল নাচিয়ে পুতুলের নাটকের পালা দেখিয়ে থাকে। অনেক মানুষেরই অজানা যে মানুষের শক্তি অসাধারণ। মানুষের শক্তি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার কাজে পুতুলনাচের ভূমিকা ছিল, আছে, থাকবে। নামে সনাতনী ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাচে হলেও সেই সাবেক কালের রূপ-আঙ্গিক আর নেই, যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই আজকের দিনে সনাতনী তারের পুতুলনাচে ঘটছে নানা পরিবর্তন। তাই 'সনাতনী' কলাকৌশল নিয়ে অস্তিত্ব বজায় রাখা যাবে না, সনাতনী তারের পুতুলনাচকে হতে হবে তুলনামূলকভাবে সমসাময়িক-সমকালীন-আধুনিক। তবে ঐতিহ্য অস্বীকার করে নয়। ঐতিহ্যের প্রতি মমতা রেখেই হতে হবে যুগোপযোগী। সরকারের সহযোগিতা নিশ্চয়ই চাইতে হবে, সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতেও হবে। কিন্তু শুধু সরকারী দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল হলে হবে না। সরকারের আসল শক্তি জনগণ। জনগণের পোষকতাতেই নদীয়ার তারের সুতোয় টানা পুতুলনাচ নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও অস্তিত্ব বজায় রেখেছে এবং ভবিষ্যতেও রাখবে বলে নির্দ্বিধ ভাবে মনে করি। কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৫৬) তাঁর কালজয়ী উপন্যাস 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-য় (১৯৩৬ সালে প্রকাশিত) উপলব্ধি করেছেন যে মানুষের জীবনের নাট্যশালায় মানুষরূপী পুতুল মহাকালের অদৃশ্য সুতোর টানে নাচে, প্রতিটি মানুষই যেন পুতুল। আমরা মনে করি, মানুষই পারে তার জীবনের ঘটনা, হাহাকার-যন্ত্রণার কথা, তীব্র সংগ্রাম-সমস্যার চিত্র আর অভিজ্ঞতায় অর্জিত শিক্ষায় উত্তরণের উপায় তুলে ধরতে। পুতুলনাচ নিঃসন্দেহে তার অন্যতম মাধ্যম। কারণ, পুতুলনাচের লোকশিল্পীদের সঙ্গে মানুষের শিকড়ের সম্পর্ক। যুগজীর্ণ প্রথা আঁকড়ে নয়, সনাতনী ঐতিহ্যের বার্ধক্যের ভারে পঙ্গু হয়ে নয়—যুগের সঙ্গে তাল মেলে পুতুলনাচের লোকশিল্পীদের শুরু হোক পথ চলা।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক পুতুলনাচের পালা

লালন ফকির

দৃশ্য ☐ ১

(দৃশ্য নদীর কূল। লালনের বসন্ত রোগ হয়েছে। শুয়ে পড়ে আছে নদীর পাড়ে)

লালন । ওগো কে কোথায় আছ ? একটু জল ! একটু জল দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচাও।
(কলসী কাঁখে নিয়ে রহিমা বিবির প্রবেশ)

রহিমা । আরে কেডারে, এই নদীর ধারে জল জল বইলা চিল্লাইছে। মনে হইত্যেছে যেন হেঁদুর ছেইলা।

লালন । কে-তুমি মা ? জল পিপাসায় আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে— একটু জল দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচাও।

রহিমা । আয়াল্লা—এতো হেঁদুর ছেইলা—কিন্তু আমি মুসলমান জোলার বিবিজান হইয়া কেমন কইরা হেঁদুর মুখে পানি দিমু—এতে যে আমার গুনা হইবো।

লালন । দাও মা—একটু জল দাও—আমার বসন্ত রোগ হয়েছে। নদীতে নেমে জল খেতে পারছি না—আমার চলার শক্তি নেই।

রহিমা । কি করি আমি। হেঁদুর মুখে পানি দিলে ওয়ার জাত চইলা যাইবো। মোল্লারা মোরে এক ঘইরা করবে। আল্লা, তুমি মোরে কইয়া দাও—আমি অখন কি করুম।

লালন । আঃ আর পারি না—প্রাণ যায়। কোথায় তুমি মা—আর দেখা হল না।
(লালনের মূর্ছা)

রহিমা । আয়াল্লা, ছেইলাডা মইরা যাইবো—আমি ওয়ার মুখে পানি দিমু। সেয়াতে যদি আমার গুনা হয় – তা হউক। দাঁড়া বাপ – অহনি তোরে আমি পানি আইনা খায়াবু।
(প্রস্থান। পুনঃ কলসী নিয়ে প্রবেশ, লালনের মুখের কাছে কলসী থেকে জল ঢালা)
খা বাপ – প্যারান ভইরা পানি খা।

লালন । আঃ বাঁচলাম। কে তুমি মা-আমার প্রাণ বাঁচালে—পূর্বের জন্মে নিশ্চয় তুমি আমার মা ছিলে —

রহিমা । আয়াল্লা, তুই আমারে মা কইলি।

লালন । হ্যাঁ, আজ হতে তুমি আমার মা।

রহিমা । ডাক বাপ-ডাক। মা কইয়া ডাক-আমারে মা ডাকার কেউ নাই-তোর মুখে মা ডাক-শুইনা মুই পরাণ ডারে জুড়াইয়া গেল।

লালন । মা—মাগো।

রহিমা । আঃ কত শান্তি।

(একতারা হাতে সাঁই সিরাজের প্রবেশ)

সাঁই । হেঃ হেঃ হেঃ-কেমনরে বেটি-আমি বলিনি যে ছেলে তুই পাবি। এই তোর ছেলে। তুই যশোদা, আর এই তোর যশোদা-দুলাল। নে কোলে তুলে নে।

রহিমা । সাঁইবাবা, এই আমার ছেইলা।

সাঁই । হ্যাঁরে বেটি — এই ছেলে জগৎ আলো করবে।

রহিমা । কেমন কইরা আলো করবে — ওয়ার গায় বসন্ত রোগ হইছে।

লালন । কে—কে — তুমি ফকির সাহেব — হ্যাঁ — এইবার আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। পুরীধামে গমনকালে আমি তোমাকে বলেছিলাম — পুরীধাম হতে ফিরে এসে আমি তোমার অনন্ত সমুদ্রে ডুব দিয়ে দেখবো — যে কি রত্ন লুকিয়ে আছে। কিন্তু — কিন্তু আমি পারলাম না — আমি বোধহয় আর বাঁচবো না।

সাঁই । দূর শালা — ঠাকুর জগন্নাথের পায়ের তলা হতে ফিরে এসেছিস — তোকে মারে কোন শালা!

রহিমা । ফকির বাবা — আমার ছেইলাকে ভাল কইরা দাও।

সাঁই । জ্বালিয়ে খেলে — সব শালারা আমায় জ্বালিয়ে খেলে। নে তোর ছেলেকে ধর — ভয় করিস নে। জাগো — আল্লা রসুল জাগো — খোদা ভগবান।

লালন । একি — একি — আমি সুস্থ বোধ করছি — আমার বসন্তরোগ ভাল হয়ে যাবে — ফকির সাহেব — তোমার জয় হোক — তোমার জয় হোক।

সাঁই । দূর শালা — আমার জয় কি রে ? জয় দে — আল্লা ভগবানের — আল্লা ভগবানের।

সকলে মিলে । আল্লা ভগবানের জয়।

(লালনকে কোলে নিয়ে রহিমার সাঁই-এর সঙ্গে প্রস্থান)

দৃশ্য ☐ ২

(দৃশ্য—লালনের বাড়ি। লালনের মা ও প্রতিবেশী বনমালী)

মা । বনমালী ! তোমরা ফিরে এলে। লালন এল না। আমার লালন কোথায় ?

বনমালী । কি বলবো মাসিমা। পুরী থেকে ফেরবার সময় নৌকায় লালনের বসন্ত রোগ দেখা দিল। কি আর বলবো — পথেই লালন মারা গেল।

(বনমালীর প্রস্থান)

মা । (ডুকরে কেঁদে উঠে) ওঃ ভগবান এ কথা শুনবার আগে কেন আমার মৃত্যু হল না। আমার কত সাধ ছিল — লালনের ছেলে হবে— আমার গলা জড়িয়ে ধরে কত আদর করবে। ওরে বৌমারে— লালন আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। বৌমা — বৌমা —। (প্রস্থান)

দৃশ্য □ ৩

(লালনের বাড়ি। লালনের প্রবেশ)

লালন । মা — মা— একি কোথায় গেলে সব — একি বাড়িঘর এমন দেখাচ্ছে কেন? মা — মা —

(লালনের মা-র প্রবেশ)

মা । কে একি — কে তুই — আমি ভুল দেখছি না তো!

লালন । কি হয়েছে মা? তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো না?

মা । হ্যাঁ হ্যাঁ — চিনবো না কেন?

লালন । তবে তুমি এমন করছো কেন? এতদিন পরে এলাম — কোথায় আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করবে। কিন্তু আমাকে দেখে অমন করছো কেন? দূরে দূরে সরে যাচ্ছো কেন? বলো মা — কি হয়েছে।

মা । আমি বলতে পারবো না — আমি যাই লালন — আমি যাই —।

(মা-এর প্রস্থান)

লালন । একি মা — এমন করে চলে গেলে কেন মা। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। দয়াবতীকে ডাকি — দয়া — দয়াবতী।

(বিধবার বেশে দয়াবতীর প্রবেশ)

দয়া । কে আমার নাম ধরে ডাকে। এমন করে নাম ধরে ডাকার মতো আমার আর কেউ নেই।

লালন । একি দয়াবতী! তোমার এ বেশ কেন? কোথায় তোমার শাঁখা-সিন্দুর-শাড়ি! বলো দয়া — এ বেশে তোমাকে কে সাজিয়েছে?

দয়া । ও গো — আমি স্বপ্ন দেখছি না তো?

লালন । না — না — স্বপ্ন হবে কেন? এইতো আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

দয়া । তবে যে বনমালীরা বললো —

লালন । (থামিয়ে)। মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা। মিথ্যা বলেছে। মিথ্যা বলে আমাব মৃত্যু রটিয়েছে। আমি মরি নি। আমি বেঁচে আছি। যাও — দয়া — তুমি সিন্দুর নিয়ে এসো — আমি আবার তোমার সিঁথি রাঙিয়ে দেবো --

দয়া । আমি এখনি সিন্দুর নিয়ে আসছি — দেখো যেন সব স্বপ্ন হয়ে না যায়।

(দয়ার প্রস্থান)

(লালনের মা ও সমাজপতি রামহরি ভট্টাচার্যের প্রবেশ)

মা । দয়া করুন—কবিরাজ মশাই — আমার লালনের কোন দোষ নাই। বিপদে পড়ে লালন মুসলমানের হাতে জল খেয়েছে— এতে কি কোন অপরাধ হতে পারে?

সমাজপতি । নিশ্চয় হয়েছে। লালন হিন্দুর ছেলে হয়ে মুসলমানের হাতে ভাত-জল

খেয়েছে। লালন হিন্দুসমাজের কলঙ্ক—বেঁচে থাকার চেয়ে লালনের মৃত্যু ভাল ছিল।

শোনো তোমরা — হিন্দু সমাজের সঙ্গে লালনের আর কোনও সম্পর্ক নেই — লালনের জাত চলে গেছে —।

লালন । যে সমাজ আমার স্ত্রীকে মিথ্যা বলে বিধবা সাজাতে পারে — শুধু বিধান দিতে পারে আর কিছুই দিতে পারে না — সেই সমাজের বিধান আমি মানি না।

সমাজপতি । কি বললে ? ছোট মুখে বড় কথা। আমি দশখানা গাঁয়ের সমাজপতি — আমার বিধান তুমি মানবে না ?

মা । ক্ষমা করুন — কবিরাজ মশাই — আপনার দুটি পায়ে পড়ি —

সমাজপতি । না-না-আমি সমাজপতি — আমাকে বিধান দিতেই হবে— শোনো লালন — আমি বলছি — আজ থেকে হিন্দু সমাজের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নাই। এমন কি তোমার মা আর স্ত্রীকেও তুমি স্পর্শ করতে পারবে না। —ঐ দেখো আকাশের বুকে আধখানা চাঁদ। এই চাঁদ ডুবে যাবার আগেই তোমাকে এই গাঁ ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমার বিধান অমান্য করলে তোমার মাকে আর স্ত্রীকে একঘরে করবো — পূজা পার্বণ হাট-ঘাট ধোপা-নাপিত সব বন্ধ করে দেবো— আমি দশখানা গাঁয়ের সমাজপতি— আমার বিধান মনে রেখো — বুঝলে ?

(সমাজপতির প্রস্থান)

লালন । আমার কি অপরাধ মা ?

মা । ওরে লালন—তোর অপরাধ নয় - এ আমার অপরাধ—আমি মহাপাপী - এর থেকে আমার মৃত্যু অনেক ভাল ছিলো—।

(মা - এর প্রস্থান)

(দয়াবতীর প্রবেশ)

দয়া । আমি সিন্দুর এনেছি গো—এই নাও—সিন্দুরে আমার সিঁথি রাঙিয়ে দাও—

লালন । দয়া—আর আমি তোমাদের নই—আমার জাত গেছে—হিন্দু সমাজের সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক নেই।

দয়া। আমাকে কোথায় রেখে যাবে ? আমি যে তোমার স্ত্রী—সহধর্মিনী।

লালন। তুমি আমার মায়ের কাছে থাকবে। ঐ দেখো—দয়া—আকাশের চাঁদ ডুবে যাচ্ছে—আমি যাই দয়া—আমি যাই— (লালনের প্রস্থান)

দয়া। ওগো—বলে যাও—আমি কি করবো।

(দয়ার প্রস্থান)

দৃশ্য ☐ ৪

(সিরাজ সাঁই এর আস্তানা)

সাঁই। মানুষ আসছে জাত হারিয়ে-কুল হারিয়ে-মানুষ আসছে।

(লালনের প্রবেশ)

লালন। সাঁইজী!

সাঁই। এসেছিস-আয়-আমার কাছে আয়। বাড়িতে গেলি—এতো তাড়াতাড়ি ফিরে এলি ?

লালন। আমার জাত গেছে—আমার হিন্দু সমাজের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক নেই—সমাজপতির বিধানে।

সাঁই। দূরশালা—তোর জাত যাবে কেনো ? জাত গেছে তাদের যারা জাত জাত বলে গোটা জাতটাকে রসাতলে দিতে চলেছে—জাত গেছে তাদের, তোর নয়। তোর একটাই জাত—মানুষের জাত—তোর একটাই ধর্ম—মানুষের ধর্ম। আজ আমি তোকে বাউল ফকিরের সাজে সাজাবো। তুই হবি বাউল সম্রাট—গানের সুরে মানুষের চেতনা জাগিয়ে তুলবি—হিন্দু নয়—মুসলমান নয়—একটাই জাত—মানুষের জাত—গড়ে তুলবি নতুন সমাজ।

(আলো কমে আসবে। মঞ্চ অন্ধকার হবে)

নেপথ্য থেকে গান শোনা যাচ্ছে। এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে—
যেদিন হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান
জাতিগোত্র নাহি রবে।।
শোনায়ে লোভের বুলি
নেবে না কাঁধের ঝুলি
ইতর -আতরাফ বলি
দূরে ঠেলে না দেবে।।
আমীর ফকির হয়ে এক ঠাঁই
সবার পাওনা খাবে সবাই
আশরাফ বলিয়া রেহাই
ভবে কেউ নাহি পাবে।।
ধর্মকুল-গোত্র-জাতির
তুলবে না গো কেহ জিগীর
কেঁদে বলে লালন ফকির
কে মোরে দেখায়ে দেবে।।

পণপ্রথার বিরুদ্ধে সামাজিক পুতুলনাচের পালা

মালাবতী

দৃশ্য □ ১

(দৃশ্য-বিনোদের বাড়ি। মধ্যবিত্ত পরিবার)

বিনোদ। একেই বলে ভাগ্য! বাবা মারা যাবার এক বছরের মধ্যেই স্ত্রী বিয়োগ হল। তারপরেই—

(নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ। পেন্নাম বিনোদবাবু—

বিনোদ। কে নন্দ কাকা—এসো—এসো—ভিতরে এসো—

নন্দ। ভিতরে যাব বাবু—কিন্তু—

বিনোদ। না-না-কোন সংকোচের কারণ নেই, এসো—

নন্দ। কর্তাবাবু গত হবার পর থেকে এবাড়ির হাল বদলে গেছে—বাবু। বড়বৌমা এসে গুছিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু ভগবানের সহ্য হল না। কর্তা যাবার এক বছর হতে না হতেই মা লক্ষ্মী চলে গেল। ভাবলাম - ছোটবাবু কলকাতা থেকে বৌ নিয়ে এসেছে—আমরা আগের মতোই এ বাড়িতে আদর পাবো। এখন —সব উলটো।

বিনোদ। আমিও তাই ভেবেছিলাম নন্দ কাকা যে ছোট ভাই গ্র্যাজুয়েট হয়েছে, উচ্চ শিক্ষালাভ করেছে। এইবার ভাল চাকরি করবে আর আমি পিতৃপুরুষের সম্পত্তি দেখা শোনা করবো। সংসারের উন্নতি করবো। তারপর একদিন আনন্দ করে ছোট ভাই এর বিয়ে দেবো-সুন্দর এক মা লক্ষ্মী বৌ নিয়ে আসবো। কিন্তু সে যাকে বৌ করে নিয়ে এসেছে—শহরের আধুনিকা মেয়ে—সে আমাদের পরিবেশ বা পরিবারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। এর মধ্যে নানা অশান্তি দেখা দিয়েছে ....। যাক্, এবার বলো কি কারণে তুমি এসেছো ?

নন্দ। বড় বাবু, আমি অনেক কষ্টে আমার মেয়ে মালার বিয়ে ঠিক করেছি। তাই তোমার কাছে এসেছি—কিছু সাহায্যের জন্যে। তাছাড়া, তুমি মালাকে তোমার নিজের ছোট বোনের মতো মনে করো—ভালবাসো। তাই আমার মেয়েটা যাতে পার হয়ে যায় সে ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

বিনোদ। মালার বিয়ে ঠিক হয়েছে—এ তো বড় আনন্দের কথা। বরের বাড়ি কোথায় ?

নন্দ। ঐ যে সোনাতলার নকুল বাগদীর ছেলে বটু গো।

বিনোদ। বটু মানে—আচ্ছা সেই ছেলেটা—

নন্দ। হ্যাঁ-হ্যা—এই তো তুমি বড়বাবু তাহলে তাকে চিনতে পেরেছো।

বিনোদ। চিনবো না—খুব ভাল করেই চিনি। তার নামে যে গাঁয়ের মানুষের অনেক নালিশ। ঐ যে কিছুদিন আগে এ গাঁয়ের পদ্মপুকুরে মেয়েরা স্নান করছিল—বটু পুকুরের পাড়ে গাছতলায় বসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারছিল আর মেয়েদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করছিল। আমি ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এক ধমক দিলাম—বটুরা পালিয়ে গেল। তা—তোমরা কি বিয়ে একেবারে ঠিক করে ফেলেছো গো ?

নন্দ। হ্যাঁ বাবু, সব ঠিক হয়ে গেছে। বটুর বাবা নকুলও ভালমানুষ নয়। তবে অনেক জমিজমা আছে। বটুও বাবার সাথে চাষবাস করে। মেয়ের আমার মোটা ভাতকাপড়ের কষ্ট হবে না। তবে—

বিনোদ। তবে কি ?—নকুল তো সুদখোর। মোটেই ভাল লোক নয়।

নন্দ। আপনি ঠিকই বলেছেন। নকুল আমার কাছে পাঁচশো টাকা নগদ চেয়েছে। আমি গরিব। বিয়ের খরচ আছে। কি করে টাকার যোগাড় করবো—ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছি না।

বিনোদ। আমি ভেবেছিলাম—মালা রূপেগুণে সুন্দরী। গাঁয়ের পাঠশালার লেখাপড়াও শিখেছে। এমন মেয়ের সঙ্গে বটুর বিয়ে ? তা তুমি পাঁচশো টাকা কোথায় পাবে ?

নন্দ। আমার চাষের সব জমি ঐ নকুল বাগদীর কাছেই বন্ধক দিয়েছি, তিনশো টাকা পেয়েছি। আরও দুশো টাকা কোথায় পাবো—তাই আপনার কাছে এসেছি—সাহায্যের জন্য।

বিনোদ। নিজের চাষের জমি বন্ধক দিয়েছো ! সারা বছর খাবে কি ?

নন্দ। এ ছাড়া, আমার আর কোন উপায় ছিল না। মেয়েটার বয়স হয়ে যাচ্ছে। গরিব মানুষ আমরা। আমার মেয়ের এমন ছেলে আর কেউ জুটবে না। তুমি একটু দয়া করে সাহায্য করো—

বিনোদ। আচ্ছা। আমি দেখছি। যথাসাধ্য সাহায্য করবো।

নন্দ। পেন্নাম বড়বাবু, তুমি দেবতা—তোমার পায়ে গড় হই।

(নন্দর প্রস্থান)

বিনোদ। না: আমাকে আর বসে থাকলে চলবে না। অনেক কাজ বাকি। এখনি কাজে বের হতে হবে।

(বিনোদের প্রস্থান)

দৃশ্য □ ২

(নন্দ বাগদীর বাড়ি। বিবাহবাসর। মৃদু সুরে সানাই বাজছে। নকুল, বরবেশী বটু ও বরযাত্রীদল)

নন্দ । এসো ভাই নকুল দাদা। এই কে কোথায় আছিস বরযাত্রীদের পা ধোয়ার জল দে — তামাক দে জলখাবার দে।

নকুল । দেখো ভাই নন্দ। লগ্নের আর দেরি নেই। এখনই বিয়ে বসবে। তার আগে আমার পাওনা মিটিয়ে দাও। সব পাওনা মিটিয়ে দিয়ে কনে দান করবে তার আগে নয়।

নন্দ । তাতো বটেই। মা মালাকে নিয়ে আসছি এখনই।

(কনের সাজে মালা। মালাকে নিয়ে কয়েকজন মেয়ের প্রবেশ)

নন্দ । বেয়াই মশাই — নকুলদা, এবারে কনেকে আশীর্বাদ করো। তার পর বিয়ের আসরে নিয়ে যাব।

নকুল । তার মানে ? সেটি হচ্ছে না। আগে আমার পনের টাকা মিটিয়ে দাও —— তারপর বিয়ে।

নন্দ । নকুলদা, দয়া করো। তোমাকে চারশো টাকা দিয়ে এসেছি আগেই। বাকি একশো টাকা এখন দিতে পারছি না। বিয়ের কেনাকাটায় অনেক খরচ হয়ে গেল। আমি একমাসের ভিতর তোমাকে একশো টাকা দিয়ে আসবো।

নকুল । কি করে দেবে ? তোমার চাষের জমি আমার কাছে আগেই বন্ধক দিয়ে তিনশো টাকা নিয়েছো। তারপর তিনদিন আগে তোমার বসতজমিবাড়িও আমার কাছে বন্ধক দিয়ে হাজার টাকা নিয়েছো। তোমার আর আছে কি ? তুমি টাকা দিতে পারবে না।

নন্দ । বিয়েতে অনেক খরচ হয়ে গেল। তোমার টাকা নগদে দিতে না পারলে তোমার জমিতে গতর খাটিয়ে চাষ করে শোধ করে দেবো — একশো টাকা।

নকুল । আমার নাম নকুল বাগদী। ও সব ভিজে কথায় আমি ভুলি না। আগে টাকা মেটাও, তারপর মেয়ের বিয়ে দাও।

নন্দ । একটু দয়া করো। লগ্ন যে বয়ে যায়। আগে বিয়ে হয়ে যাক। তারপর আমি কথা দিচ্ছি——তোমার টাকা তোমাকে দেবো।

নকুল । ওরে বটু। এখানে বিয়ে হবে না। উঠে আয় পনের টাকা না মিটালে আমি তোকে বিয়েতে বসতে দেবো না।

শোনো ভাই নন্দ, তুমি এখনই আমাকে টাকা দাও। তা না হলে এ বিয়ে হবে না। আমি এখুনি বটুকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।

নন্দ । তোমার দুটি পায়ে পড়ি নকুলদা। তুমি এ বিয়ে ভেঙে দিও না। আমার মেয়েটার যে আর কোথাও বিয়ে হবে না। তুমি দয়া করো। (নন্দর কান্না)

নকুল । কান্নাকাটি করে কোনও লাভ হবে না। তোমার চালাকি আমি বুঝে ফেলেছি। ফেলো কড়ি মাখো তেল। আগে টাকা দাও — তারপর এ বিয়ে হবে।

মালা । (কান্নায় ভেঙে পড়ে) বাবা! তোমার এ দশা দেখার আগে আমার মরণ কেন হলো না!

নন্দ । মা, তুই কেন মরবি? মরতে হয় মেয়ের বাবাদের। কারণ, তাদের অপরাধ — তারা যে মেয়ের বাবা। তাদের অপরাধ — তারা গরিব। তাদের অপরাধ — পণের টাকা দেবার ক্ষমতা নেই —

(এমন সময় বিনোদের প্রবেশ)

বিনোদ । কি হয়েছে নন্দ কাকা। কান্না কেন?

নন্দ । আমার পোড়া কপাল। কেন আমার মরণ হল না। আমি পণের টাকা সব দিতে পারিনি — তাই মালার বিয়ে হবে না— বর চলে যাচ্ছে।

বিনোদ । আঃ, বটু তুমি উঠে যেও না। আপনারা সকলে বসুন। পণের কত টাকা দিতে পারো নি নন্দ কাকা?

নন্দ । মাত্র একশো টাকা। এ টাকা আমি দেবো, এখন দিতে পারছি না। একমাসের মধ্যেই দেবো — আমি কথা দিচ্ছি।

বিনোদ । তাহলে গোলমাল আর কান্না কেন? ভাল ভাবে বিয়ে হয়ে যাক। আপনি বাকী একশো টাকা একমাসের মধ্যেই দেবেন কিন্তু।

নন্দ । হ্যাঁ আমি দেবো।

বিনোদ । তাহলে বিয়ে শুরু হোক —

নকুল । তুমি কে হে আমাদের ঘটনায় নাক গলাতে এসেছো? টাকা না পেলে এ বিয়ে হবে না। তোমার যদি এতই দরদ — তাহলে তুমিই টাকাটা দাও না?

বিনোদ । এখন — এই মুহূর্তে আমার কাছে টাকা নেই। টাকা নিয়ে তো আমি আসিও নি। আমি কথা দিচ্ছি — আমিই টাকা দেবো, চিন্তার কোনও কারণ নেই।

নকুল । আমি বাকিতে কারবার করি না। টাকা এখনই চাই। তা না হলে বিয়ে হবে না।

বিনোদ । তবে রে শয়তান! অর্থপিশাচ — সুদখোর — অভদ্র জানোয়ার —

নকুল । কিঃ আমাকে গালাগালি। তবে রে — বটু, চলে আয়। বরযাত্রীরা, তোমরা চলে এসো। এ বিয়ে হবে না।

(সঙ্গে সঙ্গে নকুল বটু ও বরযাত্রী নিয়ে দ্রুত প্রস্থান)

নন্দ । কি করলে বাবা। আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেলো — আমার মেয়ের যে আর বিয়ে হবে না —

মালা । বাবা — তুমি আমার জন্যে চিন্তা করো না। আমার আর বেঁচে থেকে লাভ নেই। আমি আজই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরবো।

বিনোদ । মালা – শান্ত হও। নন্দ কাকা, আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করে মালার বিয়ে দেব – ভাল পাত্রের সাথে।

নন্দ । তা কি করে হয় বাবা! মালার গায়ে হলুদ হয়ে গেছে – আইবুড়োভাত খাওয়াও হয়েছে। এখনই আজ রাতে মালার বিয়ে না হলে, আর বিয়ে দেওয়া যাবে না। কেউ মালাকে আর বিয়ে করবে না।

বিনোদ । তা আজ রাতের মধ্যে পাত্র খুঁজে পাবো কি করে? এখনই তো পাত্র আনা যাবে না। আমি আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করবো – সুপাত্রের সঙ্গেই মালার বিয়ে দেবো।

মালা । সুপাত্র হয়তো মিলবে, কিন্তু সে যখন আমার এই বিয়ে ভাঙার কথা শুনবে – তখন আর আমাকে বিয়ে করবে না। কেউ আমাকে বিয়ে করবে না। আমি যাই – আমি এখনই নদীতে ঝাঁপ দেবো —

(মালা এগিয়ে যায়। বিনোদ বাধা দেয়—)

মালা । আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। আমাকে মরতে দাও—

বিনোদ । বেশ! তাহলে আমিই মালাকে এই রাতে এখনই বিয়ে করবো – আপনাদের সকলের যদি কোনও আপত্তি না থাকে।

নন্দ । এ কি কথা বলছো তুমি। তোমবা উঁচু জাত্ত, আমরা নিচু জাত। আমার মেয়েকে বিয়ে করলে তোমার জাত যাবে যে — সমাজ আছে, সমাজ মানবে কেন?

বিনোদ । সমাজ? কিসের সমাজ? যে সমাজ পণপ্রথা মেনে নেয় সেই সমাজ? এক শ্রেণীর মানুষ নিজেদের স্বার্থে সমাজে কুপ্রথা চালু করে – যুগ যুগ ধরে চলে আসছে মানুষবিরোধী পণপ্রথা। আর জাত! সব মানুষই এক – কেউ আলাদা নয়। সকলের গায়ের রক্তের রঙই লাল। কেউ ছোট-বড় নয় জাতের বিচারে। জগতে আছে শুধু দুটো জাত-গরিব আর ধনী। —আমি – আমি – এই রাতে এখনই মালাকে বিয়ে করবো – মালাকে আমি মরতে দেবো না —

নন্দ । বাবা- কি বলে যে তোমাকে আশীর্বাদ করবো– বুঝে উঠছি না। ওরে মালা — প্রণাম কর-প্রণাম কর। ওরে, আজ আমার কি সৌভাগ্য! ভাঙা ঘরে চাঁদের উদয়। ওরে তোরা শাঁখ বাজা — উলুধ্বনি দে। এখনি বিয়ের আসর বসবে—

(মালা বিনোদকে গড় হয়ে প্রণাম করে— মঞ্চে অন্ধকার হয়ে আসে। শাঁখের আওয়াজ উলুধ্বনি — সানাই জোরে বাজতে থাকে)।

[পালাকার : সতীশ সমাদ্দার]

পৌরাণিক পুতুলনাচের পালা

ভক্ত প্রহ্লাদ

দৃশ্য □ ১

(দৃশ্য - রাজপ্রাসাদ। হিরণ্যকশিপু [ভক্ত প্রহ্লাদের পিতা] ও আর তাঁর মা)

হিরণ্য । তারপর — তারপর কি হলো মা - বলো মা—

মা । তারপর সেই হীন নারায়ণ বরাহমূর্তি ধারণ করে তোমার সহোদর ভ্রাতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করলো! উঃ আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। আমি জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছি। পুত্র আমার হিরণ্যকশিপু—তুমি প্রতিশোধ নাও - প্রতিশোধ নাও। তুমি দৈত্যরাজ— তুমি প্রতিশোধ নিয়ে তোমার ভ্রাতৃহত্যার উপযুক্ত জবাব দাও— তুমি আমাদের বংশের বীরত্বের গরিমা প্রতিষ্ঠা করো—তুমি প্রতিশোধ নিয়ে অমর হও। আমি মা—আমার আশীর্বাদ নাও পুত্র।

হিরণ্য । তাই হবে মা। আমি প্রতিশোধ নেবো—আমার সহোদরকে নিধন করার জবাব দেবো—প্রতিহিংসায় আমিও জ্বলেপুড়ে যাচ্ছি—কাপুরুষ নারায়ণ (হুংকার)

(নেপথ্যে শোনা যাবে বিবেক গীত)

ভগবান চিরজয়ী ভগবান
ইঙ্গিতে যার সৃষ্টিপ্রলয়
চারিদিকে শুধু তাঁহারি জয়ের গান...ভগবান...ভগবান।
যেদিকে ফেরাবে নয়ন তোমার
সেদিকে হেরিবে সে রূপ তাঁহার
সর্বভূতে তাঁর যে বিকাশ তাহাতেই হবে লয়....ভগবান...ভগবান।।

হিরণ্য । দূর হয়ে যা উন্মাদ গায়ক। নির্বোধ-চিরজয়ী ভগবান! এইবার দেখবে তোমার কথা মিথ্যা-তোমার গান পাগলের প্রলাপ—ভগবানের কোনও ক্ষমতা নেই। আমি অমিতশক্তিধর, আমিই চিরজয়ী — দেখাবো এবার তাকে আমার ক্ষমতা— আমার শক্তি—চূর্ণ করব ভগবানকে—

মা । তাই করো পুত্র। বন্দী করে নিয়ে এসো সেই নারায়ণকে—তারপর তাকে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করো—

হিরণ্য । মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য।

মা । আশীর্বাদ করি—তুমি জয়ী হও রণে— (প্রস্থান)

হিরণ্য । সেনাপতি — সেনাপতি—

হিরণ্য । বড় দুঃসংবাদ। সেই নারায়ণ বরাহমূর্তি ধারণ করে আমার সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সংহার করেছে—আমি-আমি প্রতিশোধ নেব। আমার আদেশ—আমার

সেনাবাহিনীকে চারদিকে পাঠাও—ছলে-বলে-কৌশলে সেই নারায়ণকে ধরে নিয়ে আমার কাছে হাজির করো। হ্যাঁ, আমার আদেশ—এ রাজ্যে নারায়ণের পূজা বন্ধ, কেউ নারায়ণকে পূজা করতে পারবে না—নারায়ণের নাম নিতে পারবে না— তার নামগান করতে পারবে না। যদি কেউ নারায়ণের পূজা করে, তাকে মানে—তাহলে তাকে হত্যা করবে নির্মমভাবে। আমার আদেশ যেন অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়—

সেনাপতি । যথা আজ্ঞা। আমি এখনই সব ব্যবস্থা করছি—আপনার কোনও চিন্তা নেই।

হিরণ্য । নারায়ণ! এইবার বুঝবে তুমি। এইবার বৈকুণ্ঠের সিংহাসনে বসবে এই হিরণ্যকশিপু। নারায়ণ—তোমার দিন শেষ।

দৃশ্য ☐ ২

(গরিব ব্রাহ্মণের বাড়ি)

ব্রাহ্মণ । গিন্নী—ও গিন্নী—তাড়াতাড়ি এসো—মহাবিপদ—

(গিন্নীর প্রবেশ)

গিন্নীর । চীৎকার করছো কেন? কি হয়েছে?

ব্রাহ্মণ । রাজার আদেশ—নারায়ণের পূজা করা যাবে না। যে করবে—তাকে হত্যা করা হবে। এখন উপায়?

গিন্নী । উপায় আবার কি? আমি নারায়ণের পূজা ছাড়তে পারব না।

ব্রাহ্মণ । চিৎকার করে বলছো কেন? আস্তে বলো। এসো—আমরা মনে মনে পূজা করি—বাইরের পূজা বন্ধ রাখি—

গিন্নী । না, তা হবে না। আমি নারায়ণের পূজা ছাড়তে পারবো না। তাতে যদি আমার প্রাণ যায়—আমাকে শূলে চড়ায়—তাহলেও যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে, নারায়ণের পূজা ছাড়তে পারব না। আমি মৃত্যুভয়ে ভীতা নই। আমার রাজা নারায়ণ। আর কোনও রাজার আদেশ মানি না। আমি নারায়ণের পূজা ছাড়তে পারবো না—

ব্রাহ্মণ । শোনো গিন্নী। বোঝবার চেষ্টা করো। বাইরের পূজা ছেড়ে দাও—এখন থেকে মনে মনে পূজা করো—

(গিন্নীর প্রস্থান ও গরিব বালক ভিখারীর ছদ্মবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ । ঠাকুরমশাই।

ব্রাহ্মণ । কে হে তুমি—একেবারে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছো ? কি চাও তুমি ?

শ্রীকৃষ্ণ । সারাদিন কিছু খাইনি। গতকাল একজনের বাড়িতে শুধু একমুঠো ভাত জুটেছিল। মা কোথায় ? মা-এর কাছে দুটি খেতে চাই। মা কে দয়া করে ডাকুন। তিনি আমাকে দুটি খেতে দেবেন—শ্রীহরির কৃপায়-—

ব্রাহ্মণ । আরে চুপ-চুপ। শ্রীহরির নাম নেওয়া এ রাজ্যে নিষেধ—এখানে শ্রীহরির নাম নিলে তোমার গর্দান যাবে। তা—তোমার নাম কি ?

শ্রীকৃষ্ণ । আমার নাম হরিচরণ।

ব্রাহ্মণ । আবার শ্রীহরির নাম। তুমি কি পাগল নাকি ? জানো না—ঐ নাম মুখে আনা যাবে না যে—

শ্রীকৃষ্ণ । বারে—আমার নাম যে হরিচরণ। ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়েছি—মাকে হারিয়েছি। আমার কেউ নেই। শ্রীহরি ঠাকুরই তো আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমার নাম হরিচরণ—আমি শ্রীহরির নামগান করে ভিক্ষা করি।

ব্রাহ্মণ । তুমি দেখছি—বিপদে ফেলবে আমাদের—

শ্রীকৃষ্ণ । বিপদ। শ্রীহরির নাম নিলে তো কোনও বিপদ হয় না। মা-মাগো-তুমি এসো মা-আমাকে দুটি খেতে দাও-আমি যে সারাদিন কিছু খাইনি—

(গিন্নীর প্রবেশ)

গিন্নী । কে গো তুমি ? কি চাও বাছা ?

শ্রীকৃষ্ণ । আমি হরিচরণ। ভিখারী। শ্রীহরির নামগান করি—আমাকে দুটি খেতে দাও মা—

গিন্নী । দাঁড়া,আমি খাবার নিয়ে আসি। (গিন্নীর প্রস্থান ও খাবার হাতে প্রবেশ করে শ্রীকৃষ্ণকে [ভিখারীবেশী] খাবার দান, শ্রীকৃষ্ণর খাবার ভক্ষণ—)

গিন্নী । বাছা আমার—সারাদিন না খেয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে। নাও জল খাও। জল খেয়ে নামগান করো।

(শ্রীকৃষ্ণ গান ধরে : 'হরি হরয়ে নমো কৃষ্ণ যাদবায় নমো'....ইত্যাদি)

গিন্নী । যেন প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

শ্রীকৃষ্ণ । এবার তাহলে যাই মা—

গিন্নী । যাই না—বলো আসি।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান)

[এমন সময় কয়েকজন সৈন্যের প্রবেশ]

সৈন্যদের একজন । এ বাড়িতে কে হরিনাম করেছে ?

ব্রাহ্মণ । এক ভিখারী বালক এসেছিল—সে হরিনাম গেয়ে গেল।

সৈন্যদের একজন । তাহলে এ বাড়িতে হরিনাম হয়েছে ? তোমার নিস্তার নেই। চলো আমার সঙ্গে—

(ব্রাহ্মণকে ধরে নিয়ে গেল সৈন্যদল)

গিন্নী । হে নারায়ণ ! তুমি আমাকে রক্ষা করো—আমার স্বামীর যেন কোনও বিপদ না হয় ?

(গিন্নীর প্রস্থান)

দৃশ্য □ ৩

(রাজপ্রাসাদ। হিরণ্যকশিপু ও বালক প্রহ্লাদ)

হিরণ্য । এসো প্রাণাধিক পুত্র প্রহ্লাদ। তুমি দৈত্যকুলের প্রদীপ। তুমি গুরুগৃহে গিয়ে কি শিক্ষালাভ করেছ—বলতো।

প্রহ্লাদ । পিতা ! আমি গুরুগৃহে গান শিখেছি।

হিরণ্য । গান শিখেছো—খুব ভাল কথা। শোনাও গান-কি শিখেছো—

প্রহ্লাদ গান ধরল :নমো—হরি, তুমি যে শ্রেষ্ঠ সবার,
তুমি বিনে সংসার হয় যে অসার।
হরি জ্ঞান
হরি ধ্যান
একমাত্র মন্ত্র সার
কিছু নাই আর—

গান থামিয়ে হিরণ্যকশিপু । চুপ-চুপ করো। দূর হয়ে যা- আমার কাছ থেকে—গুরুগৃহে এইসব মিথ্যা শিক্ষালাভ করেছো। তোমার গুরুকে আমি শূলে চড়াবো। তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

প্রহ্লাদ । পিতা—মিথ্যা নয়। সত্য। হরি নামই সত্য, আর সবই মিথ্যা।

হিরণ্য । পুত্র প্রহ্লাদ ! তোমাকে হরিনাম বন্ধ করতে হবে—ও নাম মুখে আনবে না।

প্রহ্লাদ । কেন পিতা ?

হিরণ্য । হরি আমাদের শত্রু। হরি আমার সহোদর ভ্রাতাকে হত্যা করেছে। হরি আমাদের পরম শত্রু।

প্রহ্লাদ । শত্রু। হরি তো কারও শত্রু নয়—হরি সকলের মিত্র—তিনি পরম দয়ালু। তাঁর নাম নিলে পাপতাপ দূর হয়ে যায়—

হিরণ্য । চুপ—আর কোন কথা তোমার শুনতে চাই না। আমি ঘোষণা করেছি—এ রাজ্যে হরি নাম কেউ নিতে পারবে না, নিলে তার মৃত্যুদন্ড। পুত্র প্রহ্লাদ—তোমাকে

সাবধান করে দিচ্ছি—হরিনাম আর মুখে আনবে না। ঐ নাম ভুলে যাও—

প্রহ্লাদ। এই নাম যে ভোলা যায় না—আমি আমাব প্রাণ থাকতেও হরিনাম ভুলতে পারবো না। হে দয়াময় শ্রীহরি—বিপদভঞ্জন মদ্‌সূদন—তোমার নাম আমি এ জীবনে ভুলতে পারবো না। তুমিই বলে দাও—আমি কি করবো ?

হিরণ্য। তুমি পুত্র হলেও তুমি আমার শত্রু। রক্ষী—রক্ষী— (রক্ষীর প্রবেশ)

হিরণ্য। আমার আদেশ—আমার পুত্র প্রহ্লাদ পাপিষ্ঠ—আমার পুত্র হযেও আমার শত্রুর নাম তার মুখে। তাই তার মৃত্যুদন্ড দিলাম। প্রহ্লাদকে নিয়ে গিয়ে অন্ধকার কারাগারে বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাখো। আহার বন্ধ। জল চাইলে বিষজলেব পাত্র মুখে দেবে। তাতেও প্রহ্লাদের মৃত্যু না হলে ক্ষুধার্ত সিংহের খাঁচায় ছেড়ে দেবে বা বিষধর কালকেউটের গর্তের পাশে শুইয়ে রাখবে বা জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করবে। আমি দেখব —প্রহ্লাদেব হরিভক্তি !

প্রহ্লাদ। পিতা—আমি মৃত্যুভযে ভীত নই। হরি আমার সহায়। হরি চাইলে আমার মৃত্যু হবে। হরি না চাইলে আমার মৃত্যু হবে না। আমি হরি নাম ত্যাগ করতে পরবো না।

হিরণ্য। তবে রে—রক্ষী ! তুমি দাঁড়িয়ে কি দেখছো ? আমার শরীরে দয়া নেই, মায়া নেই। পুত্র প্রহ্লাদকে নিয়ে যাও—এখনি বধ করো।

(রক্ষী প্রহ্লাদকে টেনে নিয়ে যায়)

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আসে]

(পালাকার : সতীশ সমাদ্দার)

সাক্ষরতা বিষয়ক পুতুলপালা

ময়না বৌয়ের পাঠশালা

(সূত্রধারের প্রবেশ ও গান)

শোনো ভাই গেয়ে যাই ময়না বৌয়ের গান
এই গানের মধ্যে পাবে জীবনের সন্ধান
সেদিন নবগ্রামে——
সেদিন নবগ্রামে কালী নামে একটি ভালো ছেলে
নিরক্ষর গ্রামবাসীদের ডেকে এনে বলে
শোনো সর্বজন——
শোনো সর্বজন করি বর্ণন লেখাপড়ার কথায়
কাঁঠাল ভাঙে ধূর্ত লোকে গরিব লোকের মাথায়
কত যুগ যুগ ধরে
কত যুগ যুগ ধরে ফন্দী করে নিল টিপছাপ
আর সর্বস্বান্ত করে বলে (তোর) বরাতই খারাপ
এ যে ভাগ্যের লিখন——
এ যে ভাগ্যের লিখন কে বা খন্ডন করিবেক আর বল্।
এমনি করেই যুগ যুগ ধরে করেছে কৌশল
না জানিলে লেখাপড়া——
না জানিলে লেখাপড়া পড়বে ধরা ফন্দীবাজের জালে
তাই তো বলি কাজের শেষে সবাই সন্ধ্যাকালে
এই আমবাগানে জড়ো হ ভাই রাতের ইস্কুলে
কথাটা মনে ধরলে——
কথাটা মনে ধরলে দলে দলে গরিব নরনারী
আমবাগানে জুটল এসে বসল সারিসারি
পরে কি ঘটিল ?
পরে কি ঘটিল কি রটিল কি হলো কোথায়
সে কাহিনী দেখুন বন্ধু পুতুলনাচের পালায়।

(সূত্রধারের প্রস্থান)

দৃশ্য □ ১

(একটি আমবাগানের দৃশ্য। দোতারায় মৃদু সুরে আবহ সঙ্গীত বাজছে। দুটি কাঠবিড়ালী একটি আমগাছের নিচে খেলা করছে, হঠাৎ তারা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। এমন সময় কালীপদ ও বিজয় নামে দুই যুবক একটি ব্ল্যাকবোর্ড ধরাধরি করে প্রবেশ, মঞ্চের মধ্যে নামিয়ে রেখে ডানদিক-বাঁদিক তাকিয়ে দেখে, কালীপদ একটি গাছের নিচে গিয়ে গাছটি দেখিয়ে বলে—)

কালী । এই যে বিজয় দা, এখানে বোর্ডটা লাগাও—

বিজয় । ধরো তো— (দুইজনে গাছে বোর্ডটি লাগায়)

কালী । কই মাসিমা—তোমরা এসো না—ও করিম চাচা—কই এসো—এসো—

(দোতারায় আবহ সঙ্গীত জোরে হয়। একে একে সাতজন বয়স্ক প্রবেশ করে : মাসিমা - বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। বিধবা। মুখের রেখা ও পরনের শাড়ি দেখে বোঝা যায় যে তিনি গরিব ঘরের খেটে খাওয়া মহিলা। মাসিমার পিছনে দুইজন চাষী বউ। তাদের পিছনে দাড়িওয়ালা করিম চাচা-মধ্যবয়স্ক গরিব ক্ষেতমজুর। তার পিছনে মোহন, হরিপদ ও সনাতন—গরিব চাষী। সবাই বোর্ডের সামনে গাছতলায় বসে পড়ে—মাসিমা দাঁড়িয়ে চারদিক দেখেন—)

মাসিমা । দিব্যি জায়গা বেছেছো তোমরা—বেশ নিরিবিলি—

করিমচাচা । নিরিবিলি। তবে রেললাইনের ধারে—রেলগাড়ির আওয়াজ শুনতে হবে।

বিজয় । সে একটু আধটু হবে—

মাসিমা । গাড়ি আর ক খানা—দুখানা তো মোটে—সে আর কতক্ষণ—ঝপ করে বেরিয়ে যাবে—

কালী । সুবিধা-অসুবিধা সব কিছুতেই আছে। রাতের পাঠশালা এখানে ভালই জমবে বলে মনে করি। শুরুতে একটা গান হোক। মোহন, দোতারা নিয়ে এসেছো তো ? তবে আর দেরি কেন ? নাও গান ধরো—

হরিপদ । আবার গান কেন ?

কালী । আরে গান না হলে জমে— আরে পড়াই গান —গানই পড়া—

মাসিমা । তাহলে মোহন গান ধরো—

মোহন । (দোতারা বাজিয়ে দাঁড়িয়ে নেচে নেচে গান করে)

ওরে মন — জ্ঞানের পিদীম জ্বালিয়ে মনের অন্ধকারে
চলতে হবে সাবধানে এই কাঁটাবনের সংসারে।
নইলে ভালোমন্দ খানাখন্দ দেখতে পাবে না—
কখন সাপে মারবে ছোবল টেরও পাবে না।
জ্বালাও বাতি জ্বালাও আলো ঘোচাও মনের ধন্দটারে

ওরে মন জ্ঞানের পিদীম জ্বালাও মনের অন্ধকারে।।

(চক্রবর্তীর প্রবেশ। মাথায় টাক। বয়স ৬৫ বছর। হাতে সৌখীন লাঠি। চোখে দামী চশমা। গায়ে চাদর। মোটা সাদা-পাকা গোঁফ)

চক্রবর্তী। বলি এখানে হচ্ছেটা কি হে? মিটিং টিটিং নাকি?

কালী। আরে! চক্রবর্তীকাকা আপনি? আসুন আসুন। এখানে বয়স্কদের শিক্ষার জন্যে আমরা একটা রাতের ইস্কুল খুললাম।

চক্রবর্তী। বয়স্ক শিক্ষা?

বিজয়। হ্যাঁ। আমাদের দেশের বেশির ভাগ গরিব মানুষই তো নিরক্ষর কি না!

চক্রবর্তী। তোমাকে তো চিনতে পারলাম না?

কালী। এঁর নাম বিজয় মণ্ডল। আমারই বন্ধু, বাংলায় এম. এ. পাশ করেছে। পলাশপুর গাঁয়ে বিজয়েরাই এমনি একটা ইস্কুল খুলেছে। সেখানে অনেক গরিব নিরক্ষর মানুষ সাক্ষর হয়েছে। তাই বিজয়কে ধরে আনলাম। দুচারদিন থেকে আমাদের গাঁয়ে এই ইস্কুলটাও চালু করে দিয়ে যাক।

বিজয়। (কালীকে) — ইনি?

কালী। ইনি শ্রীযুক্ত বাবু খগেন চক্রবর্তী। আমাদের গ্রামে ইউনিয়ান বোর্ডের আমলে ইনিই ছিলেন প্রেসিডেন্ট।

চক্রবর্তী। আরে ওসব কথা ছাড়ো। এখন আমি গাঁয়ের একজন মানুষ। (বিজয়কে) এখন এই কালীপদর বাপ বলাই হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। গরিব চাষী। কিন্তু যোগ্য লোক। তার কাছেই ভোটে আমি গোহারা হেরেছি।
সত্যি বলতে কি তাতে আমি খুসী বই দুঃখী হইনি বাবা। দেশের মানুষ যদি নিজে দেশের ভার নেয় তো তার চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে বলো? তাই না বিজয়বাবু? —

বিজয়। আমাকে আবার বাবু বলছেন কেন? আমি আপনার ছেলের মতো —

চক্রবর্তী। দেখলে কালী? ওরে দ্যাখ দ্যাখ শিখে নে — কথায় বলে — বিদ্যা বিনয়ং দদাতি— বিদ্যে মানুষকে বিনয়ী করে। উচ্চ শিক্ষিত বিজয় — কিন্তু তার বিনযটা দেখবার মতো। বেশ, বাবা, বেশ— তোমাকে বিজয় বলেই ডাকব।

(চক্রবর্তী চারদিকে তাকায়—-)

তা জায়গাটা বেশ বেছেছো।

(আবার তাকিয়ে পড়ুয়াদের খুঁটিয়ে দেখে—-)

বাঃ ছাত্রছাত্রীও তো ভালোই জুটেছে দেখছি। ওটা কে? করিম না—

করিম। আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু — আমি করিম সেখ।

চক্রবর্তী। আরে এটা মোহন না। তা বাবারা সব তো দেখছি ক্ষেতমজুর— সারাদিন ঐ হাড়ভাঙা খাটুনী খেটে — রেতেব বেলায় আবার পড়া? পারবি তো?

(মাসিমাকে দেখে মাসিমার উদ্দেশ্যে—-)

আরে! বৌঠান ? তুমিও এসে জুটেছ ? সঙ্গে আবার তোমার গিন্নির দল –

মাসিমা । তা এই কালীপদরা গিয়ে বুঝালো। কি আর করি, বুড়ি বয়সে আবার পড়াশুনা শুরু করলাম –

চক্রবর্তী । বাঃ বেশ। একটা কাজের মতো কাজ করেছে কালীপদ। বাপকা বেটা। এ্যাঁ...হাঃ হাঃ ! তা ভালো কথা কালী, বিজয়ের থাকাটাকার কি ব্যবস্থা ?

কালী । আমাদের বাড়িতেই থাকবে-খাবে।

চক্রবর্তী । ঠিক আছে। কোন অসুবিধা হলে সোজা আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। আমাদের অতিথি -- গাঁয়ের দুর্নাম না হয়- সেটা তো দেখতে হবে – কি বলো তোমরা ?

সকলে । সে তো বটেই।

চক্রবর্তী । তো আমি চলি। তবে কালীকে একটা কথা বলি। তোমার বাপ চেয়েছিল – তুমি চাকরীবাকরী করে সংসারটাকে সাহায্য করবে– তুমি কিছু না করে গাঁয়ে পড়ে আছো—এটা ভালো নয় বাবা–

কালী । চাকরী ? চাকরী কি চাইলেই পাওয়া যায় কাকা ? ––দেশে হাজার হাজার বেকার––

চক্রবর্তী । যাগ্‌গে তর্ক করে লাভ নেই। তুমি যখন তোমার বাপের মতোই ঘরের খেয়ে সমাজসেবা করবে-- তখন করো। গরিব গোবরোরা অ আ ক খ শিখবে। ভালো –– ভালো–– (একটু থেমে)-আমি এখন চলি ––

(এমন সময় চাষী যুবক হরির প্রবেশ, সঙ্গে তার বৌ ময়না)

হরি । কালীদা, তোমাদের একটা ছাত্রী জুটিয়ে আনলাম––

কালী । ছাত্রী ?

হরি । হ্যাঁ, এই যে আমার ঘরণী ময়না, ময়নার লেখাপড়ার খুব ইচ্ছে-তাই ময়নাকে নিয়ে এলাম––

বিজয় । বাঃ বাঃ এই তো চাই–

চক্রবর্তী । ঘরের সোমত্ত বৌ– এই রেতের ইস্কুলে এই আমবাগানে এসে পড়বে—তোর বাপ রাজী হল হরি ? ঝামেলা করে নি ?

হরি । করেনি আবার। লাঠি নিয়ে তেড়ে উঠে বলে—আমরা গরিব হতে পারি—তাই বলে ঘরের বৌ যাবে রেতের বেলা একগাঁ লোকের সঙ্গে পড়তে––

চক্রবর্তী । তারপর ?

হরি । তারপর আর কি ? অনেক বোঝালাম –

চক্রবর্তী । কি বোঝালি ?

হরি । বললাম—রেতের বেলা তো আমিও পড়তে যাবো– ময়না আমার সাথেই যাবে– আসবে। তখন একরকম নিমরাজী গোছের হলো—তা, কর্তা, আপনি হঠাৎ আমাদের এখানে ?

চক্রবর্তী । কেন বাপ? আমি কি পাঁচজনের বাইরে না কি?

হরি । না, তা না, তবে আপনি আমাদের মতো মুখ্যুও নন, গরিবও নন—তাই—

চক্রবর্তী । তুই বড় উগ্র রে হরি? অতো ভাগাভাগি ভালো নয়। গাঁয়ে একটা ইস্কুল হচ্ছে—আমাদের সবাইকেই—

হরি । থাকলে তো ভালই ছিল কর্তা, কিন্তু সবাই থাকে না যে—

চক্রবর্তী । বলিস কি রে ব্যাটা? থাকে না মানে? এ গাঁয়ের কোন লোকটা বলবে – ইস্কুল করা ঠিক হয়নি? বলবে কেউ?

হরি । বলবে কি – বলতে লেগেছে—

চক্রবর্তী । বলতে লেগেছে? কে সে? শুনি?

হরি । আপনি জানেন না?

চক্রবর্তী । আমি কি করে জানবো?

হরি । বলছে ঐ বিষ্টু ঘোষ বাবু, তারপর নরেশ সা মহাজন-আপনার সঙ্গে তো তাদের খুব খাতির—তারাই বলছে—

চক্রবর্তী । কি বলছে?

হরি । বলছে—বয়স্কদের আবার লেখাপড়া হয় না কি? পড়বে তো কচি কচি ছেলেরা। বলছে —গাঁয়ের বৌ-ঝিরা গিয়ে ব্যাটা ছেলেদের গা ঘেঁষে বসে পড়বে— ঘেন্নার কথা— সে নাকি অনাচার।

চক্রবর্তী । তা-ই বল্। বিষ্টু! হ্যাঁ। ওর কথা ছেড়ে দে—ওটা মাথা পাগলা—

হরি । তেজারতি-মহাজনীর বেলায় মাথা একটুও বিগড়োয় না—

চক্রবর্তী । যাগ্ গে—যাগ্ গে – ওর কথা ছাড়ান দে। মুখের কথা বলেছে। তাই অত উগ্র হলে হয়। তোরা কাজে লেগে যা। আমরা আছি। চলি বিজয় বাবাজী। পারো তো কাল একবার আমার বাড়িতে যেয়ো।— (চক্রবর্তীর প্রস্থান)

হরি । কালীদা— চক্কোত্তি এখানে কেন? ব্যাটা সুদের মহাজন— ওর মতো বদলোক এ গাঁয়ে আর কেউ নেই—

কালী । তোর সব কিছুতেই খালি সন্দেহ। পঞ্চায়েতের ভোট নিয়ে যা হয় হয়—এটা ইস্কুল। এখানে চক্রবর্তী কাকা সাহায্য করতে চায়—তাতে আপত্তি কি আছে?

হরি । চক্কোত্তি সাহায্য করবে—সেদিন পুবের সূয্যি পশ্চিমে উঠবে। তাছাড়া ওই বিষ্টু ঘোষ নরেশ সা মহাজন—ওরা তো চক্কোত্তিরই লোক।

মাসিমা । তুই থাম তো হরি। বাজে বকিস নি।

হরি । বাজে না মাসি। বিষ্টু নরেশের দলবল আমাদের ইস্কুলটাকে ভালো নজরে দেখছে না।

মাসিমা । খারাপ নজরেই বা দেখতে যাবে কেন? ইস্কুল তাদের কোন পাকা ধানে মই দিচ্ছে?

হরি । তো দিচ্ছে না? বল কি? গরিব লোকে লেখাপড়া শিখলে তাদের মাথায় যে আর কাঁঠাল ভেঙে খেতে পারবে না— সে তারা ভালোই বোঝে—

কালী । থাম তো। যে যা বুঝে বুঝুক। আমরা আমাদের কাজ করি। নাও–বিজয়–ইস্কুলের কাজ শুরু করো–সবাই বসে পড়ো।

(সবাই বসে। বিজয় বোর্ডে যায়—)

বিজয় । আমাদের মন্ত্র—শিক্ষা হচ্ছে শক্তি—শিক্ষা হচ্ছে চেতনা। লেখাপড়া শিখলে মানুষ সক্ষম হয়–সচেতন হয়। সবাই এক সাথে বলুন–শিক্ষা হচ্ছে শক্তি–শিক্ষা হচ্ছে চেতনা—

(সকলে এক সাথে বলে—। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আসে)

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ আয়োজিত রাণাঘাটে ২২ জুলাই—৫ আগস্ট ১৯৯০ অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলার নানা অঙ্গের পুতুলনাচের শিল্পীকর্মীদের আবাসিক নিবিড় প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুতুলনাচের শিল্পীকর্মীরা হীরেন ভট্টাচার্য রচিত 'ময়না বৌয়ের পাঠশালা' সাক্ষরতার পুতুলনাচপালা সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। এখানে শুধুমাত্র প্রথম দৃশ্য মুদ্রিত হল। নদীয়ার তারের সুতোয়টানা পুতুলনাচের শিল্পীকর্মীরা 'ময়না বৌয়ের পাঠশালা' সহ নানা নামে এই সাক্ষরতার পুতুলনাচ পালা এখন পরিবেশন করে থাকেন।]

সমসাময়িক পুতুলনাচের পালা

ক্ষুদে পটুয়ার রূপকথা

অত্যাচারী রাজার ছবি আঁকেন প্রাচীরে,
তাই না দেখে জঙ্গী রাজা খাপ্পা হলেন অচিরে।

বৃদ্ধ পোটো বিপদ বুঝে আশীর্বাদের সাথে,
জাদুর তুলি দিলেন তুলে আপন ছেলের হাতে।

তেড়ে এলো যুদ্ধসাজে সৈন্য সেপাই সকলে,
বন্দী হলেন বৃদ্ধ পোটো ক্রুদ্ধ রাজার কবলে।

বৃদ্ধ পোটোর পুত্র এবার দেওয়ালে পট ঝুলিয়ে,
শুভ্র বকের আঁকলো ছবি পিতার তুলি বুলিয়ে।

হঠাৎ সবাই দেখলো চেয়ে, অবাক কাণ্ড আরে!
পটটি ছেড়ে বক উড়ে যায় নীল আকাশের পারে।

খবর পেয়ে রাজার সেনা ধরলো ক্ষুদে পটুয়াকে,
বললো রাজা জ্যান্ত ড্রাগন আঁকতে হবে তাকে।

তুলির টানে পটের ড্রাগন উঠলো নড়ে চড়ে,
পটটি ছেড়ে রাজার ঘাড়ে ঝম্প দিয়ে পড়ে।

সুযোগ বুঝে পোটোর ছেলে করলো পলায়ন,
ঘোড়ার পিঠে ক্রুদ্ধ রাজা করলো অনুসরণ।

বিপদ বুঝে পোটোর ছেলে রাজার ছবি আঁকে,
আসল রাজায় মারতে এবার পটের রাজা জাগে।

পোটোর ছেলে আড়াল থেকে দেখলো চেয়ে অতঃপর,
আসল নকল দুই রাজাতে লড়াই চলে ভয়ঙ্কর।

যুদ্ধ শেষে উভয় রাজার রইলো না কেউ অবশেষ,
বাঁচলো মানুষ, বাঁচলো পোটো, স্বস্তি পেল সারাদেশ।

অত্যাচারী জব্দ হলেন জাদুর তুলির ঘায়,
রাজ্য জুড়ে সবাই মিলে আনন্দে গান গায়।

[কলকাতার সুবিখ্যাত সমসাময়িক পুতুলনাচের দল PEOPLE'S PUPPET THEATRE (১৯৭৭ সালে স্থাপিত) প্রযোজিত অসামান্য পুতুলনাচের পালা 'ক্ষুদে পটুয়ার রূপকথা' ('লিয়াং এণ্ড হিজ ব্রাশ' নামক চীনা রূপকথা অবলম্বনে পুতুলনাটিকা), নাট্যকার হীরেন ভট্টাচার্য।]

সংযোজন

☐ পুতুলনাচের পালার অংশবিশেষ ☐

★ নদীয়ার তারের সুতোয়টানা ঐতিহ্যবাহী সনাতনী পুতুলনাচের পালার (লালন ফকির/ মালাবতী/ ভক্ত প্রহ্লাদ) অংশবিশেষ।

★ পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত পুতুলনাচের শিল্পীকর্মীদের প্রশিক্ষণ শিবিরে মঞ্চস্থ সাক্ষরতা বিষয়ক পুতুলনাচের পালা 'ময়না বৌয়ের পাঠশালা'র অংশবিশেষ।

★ সমসাময়িক অসনাতনী (Contemporary Non-traditional) পুতুলনাচের পালা 'ক্ষুদে পটুয়ার রূপকথা'র অংশবিশেষ।
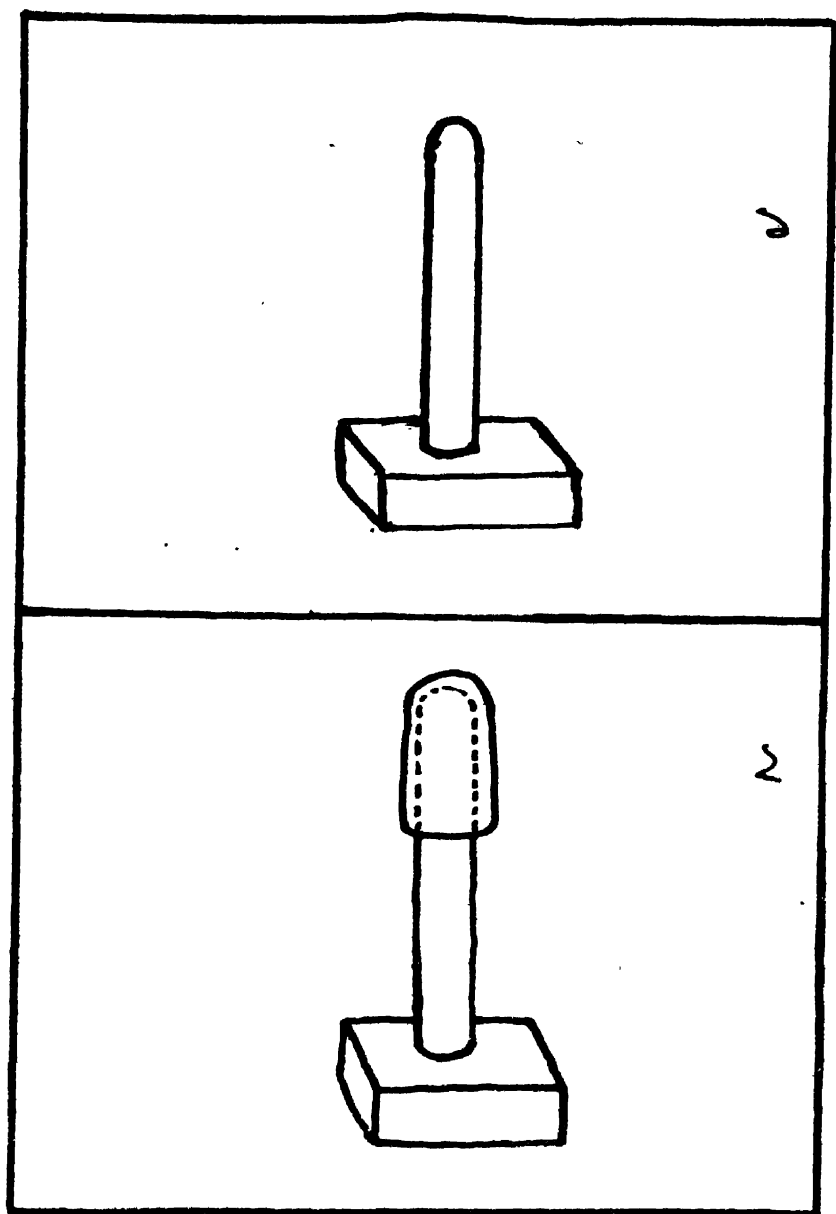
সেকালের নদীয়ার বেনীপুতুলনাচের পুতুলতৈরির সরঞ্জাম
(প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়)
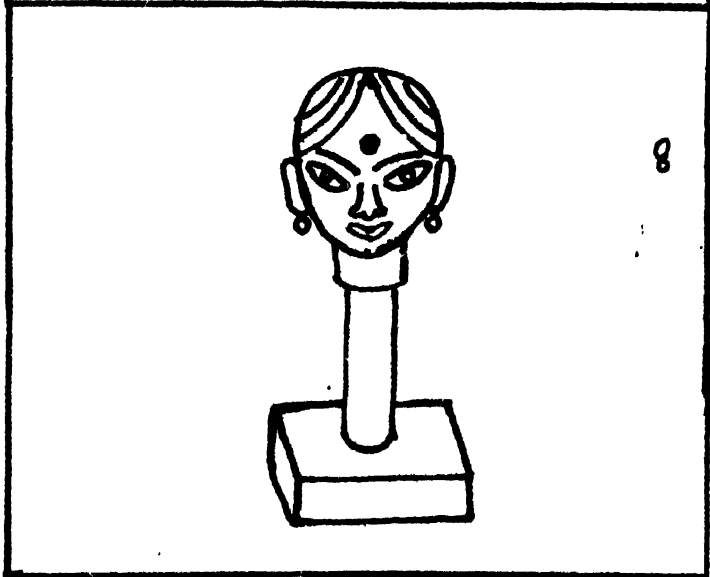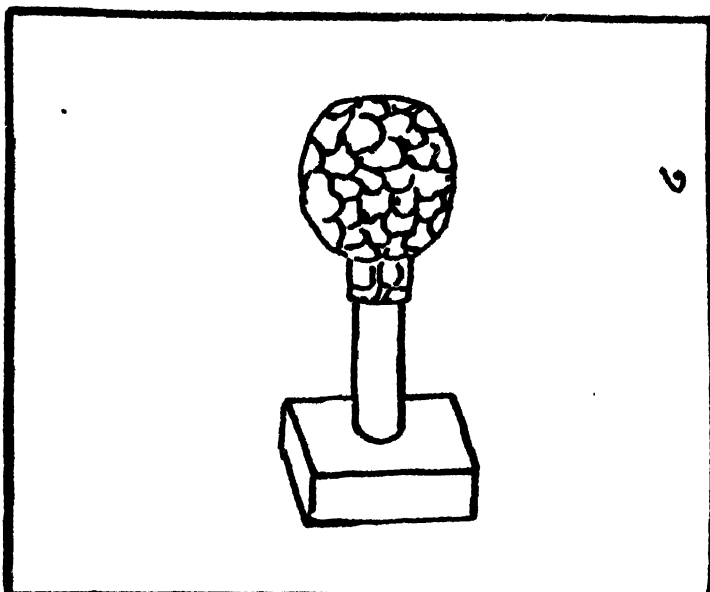
সেকালের নদীয়ার বেনীপুতুলনাচের পুতুলতৈরির সরঞ্জাম
(তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়)
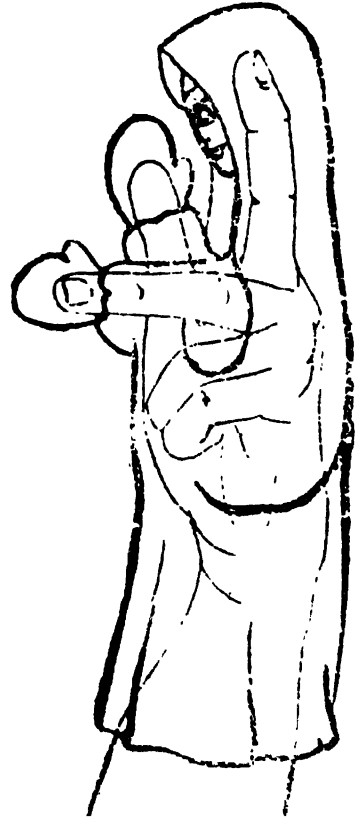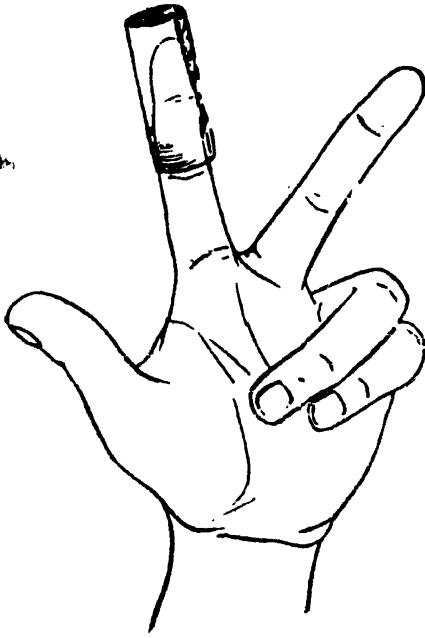
বেনীপুতুলনাচ সঞ্চালন
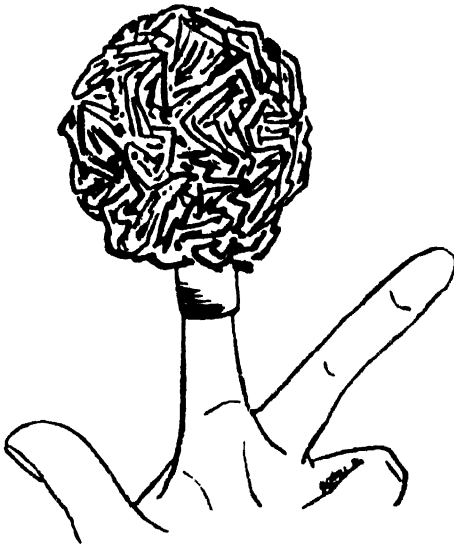
হাতের আঙুলে বেনীপুতুলনাচের পুতুল তৈরি
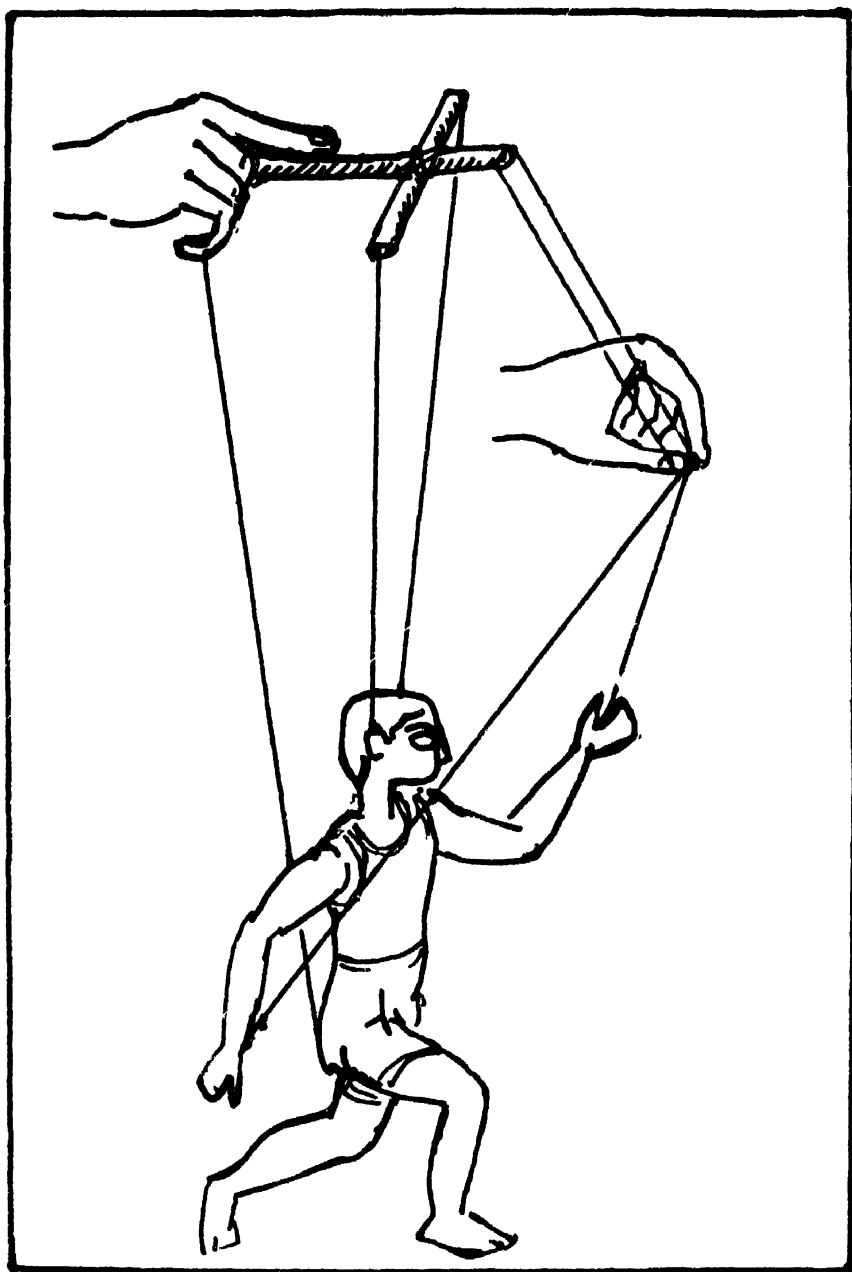
সুতোয় টানা পুতুলনাচ : পুতুল সঞ্চালন

ডাণ্ডের পুতুলনাচ : পুতুল সঞ্চালন

ডাঙের পুতুলনাচ দেখাচ্ছেন জগদীশচন্দ্র হালদার

বেণীপুতুলনাচ দেখাচ্ছে একজন লোকশিল্পী

সুতোয় টানা পুতুলনাচ শেখাচ্ছেন মহিলা পুতুলনাচ শিল্পী সুমিত্রা মিস্ত্রী

সুতোয় টানা পুতুলনাচ দেখাচ্ছেন সুমিত্রা মিস্ত্রী

‘লালন ফকির’ সুতোয় টানা পুতুলনাচ পালার দৃশ্য

নদীয়া জেলা

দী সুতোয় টানা পুতুল পুতুল

উপরে : সমসাময়িক পুতুলনাচের রূপকার সুরেশ দত্ত

নিচে : নদীয়ার পুতুলনির্মাতাশিল্পী অমরকৃষ্ণ দাস

নদীয়ার সুতোয় টানা পুতুলনাচের শিল্পী যখন বহুদূরে
পুতুলনাচ দেখাচ্ছেন, তখন সেই পরিবারে দেখা দেয় নানা সংকট

রাণাঘাটে পুতুলনাচের শিল্পীদের প্রশিক্ষণ শিবিরে
পুতুলনির্মাণ প্রশিক্ষণ

রাণাঘাটে পুতুলনাচের শিল্পীদের প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে
সুধী প্রধান, মালিনী ভট্টাচার্য (সাংসদ), সুরেশ দত্ত, হীরেণ ভট্টাচার্য প্রমুখ

সমস তুল কার
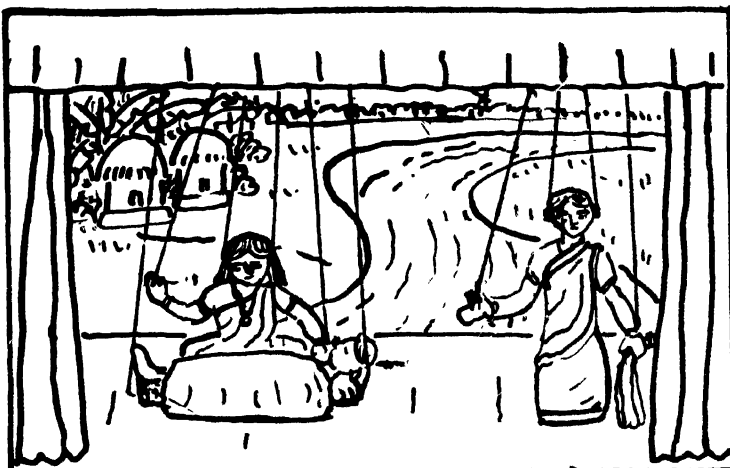
নীপুতুল

সুতোয় টানা পুতুলনাচ : বেহুলা পালা
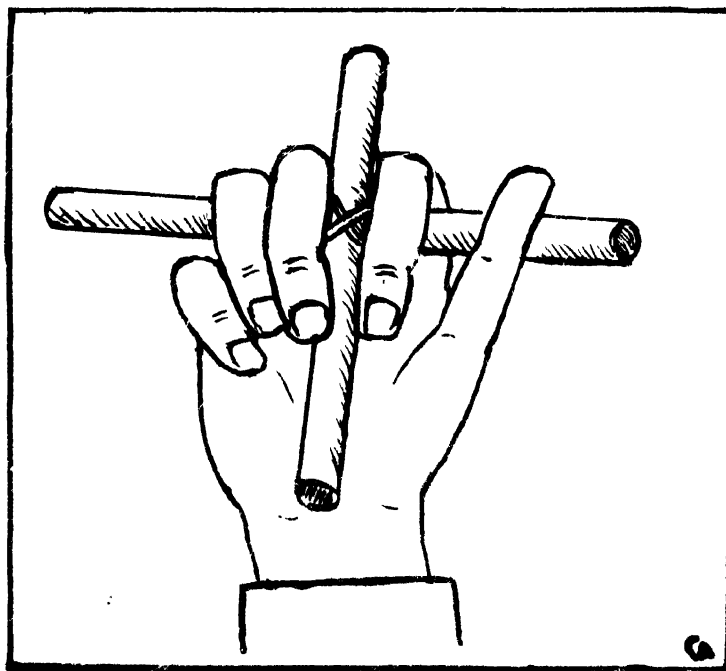
সুতোয় টানা পুতুলনাচের পুতুল সঞ্চালন যোগকাঠি